মস্তিষ্কপ্রক্ষালক যন্ত্র

স্বস্তিক সরদার

শুরুর আগে

রাজসভা ভরপুর আমোদে, প্রাচুর্য্যে। অথচ চারিপাশ কেমন অন্ধকার। রাজা বসিয়াছেন সভায়। তিনি বললেন পুরোনো পড়াশোনা যত, সব মুছে ফেলা হোক। রাজা যত বলে পারিষদ বলে তার শতগুণ। রাজা বললেন সবই হবে নতুন, একদম নতুন। বিদূষক তার হেসে হেসে বলে "তাতে কী আর এসে গেলো?", মন্ত্রীসব মাথা নেড়ে কয় ঠিক ঠিক ঠিক! এমন সময় রাজসভার দরজা ঠেলে একজন প্রবেশ করেন, বিজ্ঞানী তিনি, বিজ্ঞানে তাঁর অগাধ জ্ঞান, প্রযুক্তি তাঁর হাতের নখের ডগায়। তিনি জিনিয়াস। রাজা অভ্যর্থনা জানালেন বটে, কিন্তু কথা বার্তায় মনে হয় তিনি বেশ খুশি নন। বিজ্ঞানী মাথা নেড়ে জানালেন তার প্রত্যুত্তর; রাজাকে দিলেন উপহার। তবুও রাজা নন খুশি।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই 'হীরক রাজার দেশে'র সেই বিখ্যাত দৃশ্য আপনার মাথায় ভেসে এসেছে। রাজা মোটেও খুশি নন, প্রজাদের কাছ থেকে তিনি পুরোনো সব পুঁথি, সব জ্ঞানের উৎস, বই, সাহিত্য— সব মুছে ফেলতে পেরেছেন বটে। তাও তিনি খুশি নন। সাত মাসে সাড়ে সাত লক্ষ মুদ্রায় বিজ্ঞানী কি না কেবল কাগজের ফুল বানায়?

বিজ্ঞানী আশ্বস্ত করেন, "ভুল, এটা সামান্য, এটা গৌণ।"

রাজার রাগ যায় না, তিনি রাগত স্বরেই জিজ্ঞাসা করেন তাহলে আসলটা কী?

বিজ্ঞানী সামান্য কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করে বলেন, "মস্তিষ্কপ্রক্ষালক!"

বিদূষক যেন লজ্জা পায়, বলে "আহাম্মক!"

জুকারযন্ত্রী

কাট টু ২০১৮। বাংলা ছেড়ে সোজা ইউ কে; আমাদের সিঙ্গল স্ক্রিনের সিনেমা ছেড়ে 16:9 স্ক্রিনের নেটফ্লিক্স। আমরা টেকনোলজির মই বেয়ে বেয়ে পৌঁছে গেছি একবিংশ শতাব্দীর ডিজিটাল যুগে। মাঝে মাঝে ভাবি, এতো টেকনোলজি, এতো বিজ্ঞানী, এতো সায়েন্স আমাদের কাছে, আমরা একটা মস্তিষ্কপ্রক্ষালক যন্ত্র বানালে কেমন হতো?

জানি না হার্ভাড ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় মার্ক জুকারবার্গ মানিকবাবুর সিনেমা দেখেছিলেন কিনা। দেখলে অবশ্য মানবজাতির প্রতি তেনার ন্যূনতম দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যেত। কিন্তু তিনি বানিয়ে ফেলেছেন সেই বিখ্যাত যন্ত্রটি— মস্তিষ্কপ্রক্ষালক যন্ত্র। এবং শুধু একটা দেশের নয় (আমাদের সময়ে তো আর রাজতন্ত্র চলে না, আমরা কর্পোরেটতন্ত্রে বিশ্বাসী), তিনি নানা দেশের রাজার হাতে তুলে দিলেন এই যন্ত্র। নাম দিলেন

"দ্য ফেসবুক"!

সাত বিলিয়নে ভরপুর পৃথিবীতে প্রায় আড়াই বিলিয়ন কাস্টোমার নিয়ে ২০২০ শুরু করে ফেসবুক। কাস্টোমার কথাটা ঠিক না, আড়াই বিলিয়ন ইউজার (user), 'ব্যবহারকারী'। হোয়াটস্যাপ, ইন্সটাগ্রাম, মেসেঞ্জার মিলিয়ে সংখ্যাটা তিন বিলিয়নে পৌঁছে যায়।

মস্তিষ্কপ্রক্ষালকের সাথে একটাই মূল পার্থক্য এর। এতে পেয়াদা দিয়ে মানুষ ধরে আনতে হয় না, জোর করতে হয় না, মানুষ তার নিজ-ইচ্ছাতেই, বরং খানিক আনন্দের সাথেই, এই ডিজিটাল মস্তিষ্কপ্রক্ষালক যন্ত্রটিতে প্রবেশ করে।

ভারতে সংখ্যাটা ২০২০তে প্রায় ৩৪৬ মিলিয়ন। আর এটাই তো স্বাভাবিক। জিও রেভলিউশন ঘটে গেছে। ভারতের বিশাল সংখ্যক জনগণের একটা সামান্য শতাংশও ইন্টারনেটের আওতায় এলে তা অনেক! স্মার্টফোন পেলে প্রথমেই আমরা ফেসবুকে লগ-ইন করি। ফেসবুকের মতো ভালো কিছু হয় না। আমাদের যা যা বলার আছে, কিন্তু বলতে পারি না, তা এখানে বলা যায়। আবার আমাদের যা যা নেই, ঠিক তাই তাই সমৃদ্ধ একটা ভার্চুয়াল বিশ্ব পেয়ে আমরা যারপরনাই খুশি। এখানে ডেটিং করা যায়, নিজের যা খুশি বলা যায়। হু হু করে ফেসবুকে ঢুকে পড়ছে আপামর ভারতবাসী, তারা চায়ের দোকান ছেড়ে ফেসবুকে তর্ক করছে। পাড়ার রক ছেড়ে ফেসবুকে স্টকিং করছে। পত্রিকা ছেড়ে ফেসবুকে সাহিত্যচর্চা করছে। এটাই তো স্বাভাবিক! নতুন করে বলে বোঝাতে হবে না, ফেবু মহাশয় আমাদের কতটা কাছের, কতটা ভালোবাসার। আমরা প্রোফাইল গঠন করেছি সুচারুভাবে, আমাদের শোম্যানশিপের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছি টাইমলাইন জুড়ে।

আধুনিকতম চুরি-ডাকাতি

এবারে মূল প্রসঙ্গে ঢুকে যাবো। আজকের দুনিয়ার সবথেকে খতরনাক চুরি, বা ডাকাতিও বলা চলে। তথ্য, বা ডেটা চুরি। ব্যাপারটা কী? সেই কবে একটা জুকারকাকুকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছিলো সাংবাদিকেরা। তিনি স্যরি বললেন সবার সামনে। সে তো কবেই মিম হয়ে হারিয়ে গেছে। ফেসবুকের মালিক একটা বড় স্ট্যাটাস ছেড়ে ক্ষমাও চেয়েছে। আমরা অবশ্য পড়িনি। অত বড় লেখা পড়া যায় নাকি! আর তাছাড়া ফেসবুকে আমার ডেটা আছেটা কী? কটা ছবি, কখন কবে স্কুলে গেছি, কার সাথে প্রেম করেছি, এই সব চুরি করে কার আবার কী হবে?

খবরটার সামান্যতম প্রভাবও আমাদের ভারতে আসেনি। অথচ ঘটনাটার জন্য ফেসবুকের স্টক ভ্যালু প্রায় ১২৯ বিলিয়ন ডলার নেমে গিয়েছিলো, প্রায় পাঁচ লাখ পাউন্ড জরিমানা পর্যন্ত দিতে হয়েছিলো ফেসবুককে, যার জন্য পুনরায় ২০১৯ সালে পাঁচ বিলিয়ন ডলার ফাইন দিতে হয়েছিলো তাদের। এই ঘটনা হয়তো জনাকয়েক টেক-স্যাভি মানুষ ছাড়া আর কেউই জানে না।

দ্য কিউরিয়াস কেস অফ কেমব্রিজ অ্যানালিটিকা

আমরা ডিজিটাল যুগে বাস করি। অথবা, আমাদের বাধ্য করা হয়েছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করে দিয়েছেন ডিজিটাল ইন্ডিয়া। কিন্তু আমরা কেমব্রিজ অ্যানালিটিকা তো দূর, আদৌ কি জানি ডেটা কী বস্তু? সে কামড়ায় না খামচায়?

সময়টা ডিসেম্বর ২০১৫। দ্য গার্ডিয়নের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী,

কেমব্রিজ অ্যানালিটিকা আমেরিকার তৎকালীন রাষ্ট্রপতির পদপ্রার্থী টেড ক্রুজের নির্বাচনী প্রচারে সাহায্য করেছিল। তারা ক্রুজের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় বাড়তি সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে লক্ষ লক্ষ ফেসবুক ব্যবহারকারীদের মনস্তাত্ত্বিক তথ্য ব্যবহার করেছে। তারপরে ২০১৬তে রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থা এই কেমব্রিজ অ্যানালিটিকা ট্রাম্পের ক্যাম্পেন ম্যানেজার ব্র্যাড পার্সকেলের সাথে কাজ শুরু করে। দু'মাস পরে ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর ক্যাম্পেন ম্যানেজারের পদে স্টিভ ব্যাননকে নিয়োগ করেন। ব্যানন, যিনি ক্যামব্রিজ অ্যানালিটিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন সেইসময়ে। প্রায় ৬ মিলিয়ন ডলার খরচা হয় প্রচারে।

কেমব্রিজ অ্যানালিটিকা একটা মাল্টি বিলিয়ন ডলার কোম্পানি, পলিটিকাল কনসাল্ট্যান্সি ফার্ম। কাজ তার রাজনৈতিক দলগুলিকে পরামর্শ দেওয়া, তাদেরকে ভোটে জেতাতে সাহায্য করা। লন্ডনে তার হেডকোয়ার্টার। ২০১৬ সালে ট্রাম্প জিতে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হলেন। ২০১৬ সালে ব্রেক্সিটও হলো। দুটো ক্ষেত্রেই নাম এলো কেমব্রিজ অ্যানালিটিকার। গার্ডিয়ান আগেই ২০১৫তে রিপোর্ট লিখেছিলো যে ফেসবুককে ব্যবহার করে এই পলিটিক্যাল ফার্মটি তাদের ক্লায়েন্টদের জন্য বিশেষ সুবিধা করে দিচ্ছে। এখন প্রশ্ন কী সেই সুবিধা?

কেমব্রিজ অ্যানালিটিকা কীভাবে কাজ করে? আর এখানে ফেসবুকের দায় কোথায়? আর ভারতের তাতে কী?

কেমব্রিজ অ্যানালিটিকার প্রাক্তন ডেটা-কনসাল্ট্যান্ট ক্রিস্টোফার ওয়াইলি অবজার্ভার সংবাদপত্রে দাবী করেন যে সংস্থাটি প্রায় ৫০ মিলিয়ন ফেসবুক প্রোফাইলের ডেটা ব্যবহার করেছে। ওয়াইলি দাবী করেছিলেন যে কেমব্রিজ অ্যানালিটিকার কাছে বিক্রি করা ডেটা তখন ফেসবুক ইউজার তথা নির্বাচনে ভোটদাতাদের 'মনস্তাত্ত্বিক' প্রোফাইল তৈরী করতে সাহায্য করেছিলো।

পরে ফেসবুক স্বীকার করে সংখ্যাটা মোটেও ৫০ মিলিয়ন নয়, সংখ্যাটা প্রায় ৮৭ মিলিয়ন।

আমাদের এখানে একটা কথা খুব চলে— জনগণকে রাজনৈতিক দলগুলো কেবল মাত্র ভোটার হিসাবে দেখে। একটা ভোট মাত্র। ব্যক্তি হিসাবে আমাদের দেখা হয় না। অন্যদিকে, কেমব্রিজ অ্যানালিটিকার প্রসেসটা ছিলো ঠিক উল্টো— কেবলমাত্র ভোটার হিসাবে নয়, প্রত্যেককে ব্যক্তি হিসাবে যাচাই করো, তাদের ব্যক্তিত্ব যাচাই করো, তাদের মনের কথা বোঝার চেষ্টা করো, তারপর চিহ্নিত করো সেইসব ব্যক্তিদের যারা সহজেই মত পাল্টায়। সমস্ত ভোটারদের ব্যক্তিত্ব পর্যালোচনা করে তাদের মনস্তাত্ত্বিক ভাবে ভাগ করো, তারপর সেইসব ব্যক্তিদের মার্ক করো যাদের খুব সহজেই প্ররোচনার মাধ্যমে প্রভাবিত করা যায়। বিখ্যাত বিগ ফাইভ পার্সোনালিটি টেস্টের মাধ্যমে তারা আমেরিকার প্রায় সব ভোটারকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করে ফেলেছিলো।

তাদের কাছে লাখ লাখ ডেটা ছিলো, তারা প্রায় চার থেকে পাঁচ হাজার ডেটা পয়েন্ট তৈরী করতে পেরেছিলো প্রতিটা ব্যাক্তির। এবার সেই ডেটা পয়েন্ট পর্যালোচনা করে, স্টাডি করে, আমেরিকার প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে একটা আগাম ধারণা করা খুবই সহজ হয়েছিলো তাদের পক্ষে। আর কারোর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা থাকলে সে কাকে ভোট দিতে পারে সেই সম্পর্কেও ধারণা করা খুব একটা কঠিন না।

ব্যাপারটা এক দিক থেকে ভাবলে, তেমন জটিল না। ভারতে অধিকাংশ মানুষ নিজেদের 'অরাজনৈতিক' বলে গর্ব বোধ করে। তাদের সামনে অবশ্যই ভোটের আগে নানা রাজনৈতিক দল থেকে নানা অপশন রাখা হয়। তারপর সেই মানুষরা তাদের ইচ্ছা মতন একটা অপশন বেছে নেয়। এটাই তো 'গণতন্ত্র', অন্তত প্রথাগতভাবে তার মূল ধারণা। 'অরাজনৈতিক' হলেও খুব ছোটো সময়ের জন্য 'রাজনৈতিক' মতবাদ রাখা— এটা গণতন্ত্রের অনেক ক'টি স্তম্ভের একটা।

কেমব্রিজ অ্যানালিটিকা আপাতদৃষ্টিতে এই নিরীহ ব্যাপারটিকেই নিয়ে যায় ক্রাইমের উচ্চ পর্যায়ে। তারা শুধুমাত্র টার্গেট মার্ক করেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা শুধুমাত্র তাদের সামনে কিছু অপশনই দেয়নি, তারা রীতিমতো ম্যানিপুলেট করেছিলো মানুষকে, এবং অনেক অপশনের মধ্যে একটি অপশনের প্রতি ঝুঁকতে বাধ্য করেছিলো। শুধু এইটুকুই নয়, এই পুরো পদ্ধতিটিই ঘটেছে সাধারণ মানুষের অজান্তে, তাদের অজান্তেই তাদের ডেটা তাদেরকেই ম্যানিপুলেট করতে ব্যবহৃত হয়েছিলো।

অ্যানালিটিকার ঝোলে জুকারবার্গীয় মশলা

এই গোটা প্রক্রিয়াটির সাথে ফেসবুক অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। প্রতিটা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব পর্যালোচনার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিলো মূলত তাদের ফেসবুকের সমস্ত তথ্য। তারা কাকে কেমন লাইক দিয়েছে, কোন পেজে কীভাবে রিয়াক্ট করেছে, কাকে কী মেসেজ করেছে, ইত্যাদি।

ফেসবুকে আমরা অনেক মিথ্যে কথা বলি। আমাদের শূন্য জীবনের ভাঁড়ারকে ভরা দেখাবার জন্য প্রতিযোগিতা করি। কিন্তু আমরা ভালো লাগার প্রায় সবকিছু, কী খাবার খেতে ভালোবাসি, কোথায় যেতে চাই, কোন নায়কের ফিল্ম পছন্দ করি, আমার স্কুল, আমার প্রেমিকার সাথে তোলা সেলফি, আমার প্রেমিকাকে স্টক করা চ্যাংড়া ছেলে, আমি বিড়াল ভালোবাসি না কুকুর, আমি মাকু না সেকু নাকি তিনু, আমি মুসলিম ভালোবাসি না হিন্দু ,আমার পছন্দ অপছন্দ, আপনি আমার ফেবু টাইমলাইন থেকে পাবেন। আর তার সাথে যদি আমি কাকে কখন লাইক দিয়েছি, শেয়ার করেছি, এসবের তথ্যও জুড়ে দেন, তাহলে আমার ব্যক্তিত্বের অনেকটা অংশ জানা হয়ে যাবে আপনার, অন্তত তত্ত্বগতভাবে। এখন তো আবার শুধু লাইক নয়, বরং লভ, কেয়ার, স্যাড এবং রাগী বোতামও রয়েছে, কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে আপনার মনোভাব ব্যক্ত করার বিভিন্ন উপায় হিসেবে। শুধু পছন্দ-অপছন্দ নয়, কারোর বা কোনো কিছুর প্রতি আমার মনের পাঁচ রকম অনুভূতির বহিঃপ্রকাশের ধরনও আপনি জেনে যেতে পারেন আমার ফেসবুকের তথ্য থেকে। আর ফেসবুক তো শুধু ফেসবুকে কতটা সময় আপনি কাটালেন সেই তথ্যই পায় এমন নয়। ফেসবুকের বাইরেও আপনি ফোনে যতটুকু সময় কাটান, সেই তথ্যও তারা পায়। এক কথায়, আপনার উপর সারাক্ষণ চলছে তীক্ষ্ণ নজরদারি।

বি.বি.সি.-র একটি ভিডিও অনুযায়ী, ফেসবুকে আপনার ১৫০টি লাইকের প্যাটার্ন যাচাই করে আপনার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে এমন সমস্ত ধারণা করা যায়, যা হয়তো আপনার বাবা-মায়েরও নেই আপনার সম্বন্ধে।

জুকারবার্গ তো দুঃখী দুঃখী মুখ করে বললেন, ওনার জানা ছিলো না যে ওনার কর্মচারীরা কেমব্রিজ অ্যানালিটিকার সাথে কাজ করেছে, জানা নেই আদৌ কাজ করেছে কি না, আমরা তো কোনো ডেটা বিক্রি করিনি,

তবুও এতো ইউজারের ডেটা লিক হয়েছে তার জন্য খুব দুঃখিত, এই নাও পাঁচ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ! অন্যদিকে প্রায় ৮৭ মিলিয়ন ব্যক্তির ডেটা, প্রায় ৩০ মিলিয়ন লোকের ফেসবুক লাইক ডেটা ব্যবহার হয়েছে তাদেরকেই ব্রেন ওয়াশ করার জন্য।

একটা খুব প্রচলিত কথা আছে, ফ্রী-তে কেউ কিছু দিলে মানুষ সেটা পাওয়ার জন্যে নিজেকেও বেচে দিতে পারে। সে জায়গায়, আমরা কথা বলছি 'ব্যক্তিগত তথ্য'র মতন কম জানাবোঝা সম্পন্ন একটি বিষয় নিয়ে। প্রথমত, যেমনটা বললাম, এ নিয়ে জানাবোঝা কম, উপযুক্ত জ্ঞান সেইভাবে সহজে মেলেও না। তাছাড়া 'ব্যক্তিগত তথ্য'র মতন এই যে জিনিসটির সাথে আমরা দিনের অধিকাংশ সময় কাটাই এবং তাকে তৈরী করে চলি, সেটির সম্পর্কে জানার ব্যাপারে আমাদের একটা তীব্র অনীহাও কাজ করে। এটা বলা যায় যে, একজন সাধারণ মানুষের কোনো ধারণাই নেই কীভাবে তাদের তথ্য ব্যবহার করে তাদেরকেই ঠকানো হতে পারে। তাদের ধারণাই নেই ডিজিটাল ডেটা বলতে আসলে কী বোঝায়! আমাদের স্মার্টফোনে আমরা দিনের অধিকাংশ সময় কাটাই। আমাদের সবকিছুই আমাদের জন্য পার্সোনালাইজড্— ইউটিউব খুললে আমাদের পছন্দের ভিডিও, আমাজন খুললে আমাদের পছন্দের শপিং লিস্ট। আবার গুগল-এর বিজ্ঞাপন তো প্রায় সবাই লক্ষ্য করেছে আশা করি। আমাদের প্রতি মুহূর্তের কাজের ভিত্তিতে আমাদের জন্য বিজ্ঞাপন তৈরী হয়। আমি জুতো কিনবো ভাবছি, জুতো সার্চ করলাম, আমাজনে দেখলাম, ইউটিউবে রিভিউ দেখলাম, প্রায় সাথে সাথে আমার সামনে নানা কোম্পানির জুতোর বিজ্ঞাপন চলে এলো, গুগলের সম্পূর্ণ ভিন্ন কোনো সাইট খুললেও সেইসব বিজ্ঞাপন দেখতে পাবো (যদি সেই সাইটটি বিজ্ঞাপন দেখানোকে অনুমতি দিয়ে রাখে)। প্রতিনিয়ত আমাদের তথ্য 'রিয়েল টাইমে' গুগলের কাছে জমা হচ্ছে। আমাদের কি চাই না চাই, সেই সব প্রতিনিয়ত রিয়েল টাইমে স্টাডি হচ্ছে আর সেই অনুযায়ী বিজ্ঞাপন আমাদের সামনে আসছে। তর্কের খাতিরে তাও এটাকে একটা ফেয়ার প্রসেস ধরা যায়। কিন্তু গত দশকে, সরকার এবং বৃহৎ কর্পোরেশন প্রত্যেকেই আমাদের কার্যক্রম, আচরণ এবং জীবনযাত্রার প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে ডেটা মাইনার হয়ে উঠেছে আমাদের অজান্তে— যা নিঃসন্দেহে অনৈতিক, রীতিমত চুরি। মূলত পার্সোনালিটি-প্রোফাইল বেস করেই গড়ে উঠেছে আজকের ডিজিটাল ইকোনমি। নেটফ্লিক্স আপনার ডেটা না জানলে কীভাবে আপনার ফেভারিট শো আপনাকে রেকমেন্ড করবে?

পণ্য এবং পরিষেবা সরবরাহ করার জন্য কিছু ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করা, আর আমাদের চিন্তাভাবনাগুলিকে পণ্য ক্রয় করা বা অন্যান্য কোনো কিছু করতে সক্রিয়ভাবে প্রভাবিত করা— এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। পিচ্ছিল আর ধোঁয়াশাপূর্ণ একটা পথ যখন আমাদের তথ্যগুলো কোনো পাবলিক ডোমেনের বদলে এক একটা বড় কর্পোরেটের নজস্ব সার্ভারের মধ্যে বন্দী করে, তখন আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিতটাই আলগা হয়ে পড়ে। কারণ আমরা তখন কেউ-ই জানতে পারিনা কোন কর্পোরেট সংস্থা কখন আমাদের স্বার্থ ছেড়ে তাদের নিজেদের ব্যবসায়িক প্রোপাগান্ডা নিয়ে কাজ করবে! সেটার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো কেমব্রিজ অ্যানালিটিকা-ফেসবুক স্ক্যান্ডাল, যেটা এতোক্ষণ আপনাদের সামনে রাখার চেষ্টা করলাম।

পার্সোনালিটি স্টাডি করে পার্সোনালিটি অনুযায়ী ভাগ করার পর, কেমব্রিজ অ্যানালিটিকা টার্গেট করেছিল সেইসব ভোটারদের যাদের প্রভাবিত

করা যায়। কীভাবে তারা এতো তথ্য পেল? সবকিছুই কি ফেসবুক বিক্রি করেছিল? উঁহু। তাহলে তো ব্যাপারটা সাধারণ ডেটা-ব্রিচিং এর কেস হতো শুধু।

আপনি ফেসবুক ব্যবহারকারী যদি হন, তাহলে আপনার নিশ্চয়ই জানা থাকবে, প্রায় সময়ই ফেসবুকে নানারকম টেস্ট আসে, নানারকম ক্যুইজ। আপনি কেমন? কেমন আপনার লাভ লাইফ? আপনি কতটা কুল? আপনি কতটা কাইন্ড? কেমন আপনার আই কিউ? সেই একই ধাঁচে পার্সোনালিটি সার্ভে শুরু করেছিল তারা।

আমরা অনেকেই এইরকম টেস্ট করে মজা নিই। টেস্টের রেজাল্ট শেয়ারও করি। আমেরিকার লোকজনও তাই করে। যারা যারা এই টেস্ট নিলো, তাদের সমস্ত ডেটা তো চুরি হলোই, পাশাপাশি তাদের ফ্রেন্ড লিস্টে যারা আছে তাদের ডেটাও চুরি হল। তার মানে আপনি এই টেস্ট পারফর্ম করলে আপনার লাইক, শেয়ার, মেসেজ ইত্যাদির পাশাপাশি আপনার চারশো ফেসবুক বন্ধু, যারা এই টেস্ট করেনি, তাদেরও সমস্ত ডেটাও চুরি হলো। সবকিছুই হল আপনার অজান্তে। এই হল তাদের ডেটা সংগ্রহের পদ্ধতি, বা বলা চলে ডেটা চুরির পদ্ধতি।

এবার আসি ম্যানিপুলেশনের কথায়। এই জায়গাটা আমার আপনার খুবই চেনা লাগবে। আমাদের ম্যানিপুলেট করতে ব্যবহার হলো স্পনসরড বিজ্ঞাপন আর ফেক নিউজ!

ফেসবুক খুলে টাইমলাইন স্ক্রল করলে দেখবেন আপনার সামনে একেকটা বিজ্ঞাপন ভেসে আসে, মাথায় ছোটো করে লেখা থাকে স্পন্সরড। কেমব্রিজ অ্যানালিটিকা ইতোমধ্যে চুরি করে নেওয়া তথ্যের উপরে ভিত্তি করে প্রতিটা এরকম পোটেনশিয়াল ভোটারের জন্য তৈরী করল পার্সোনালাইজ্‌ড্ বিজ্ঞাপন, পার্সোনালাইজ্‌ড্ ফেক নিউজ। যা আপনি-আমি হয়তো দেখবো না কোনোদিন। ওটা শুধু দেখতে পাবে তারাই, যাদের কেমব্রিজ অ্যানালিটিকা চুরি করে নেওয়া তথ্য অনুযায়ী চিহ্নিত করেছে প্রভাবিত করে ফেলা যাবে এমন ভোটার হিসেবে। হিলারি ক্লিন্টনকে মকারি করে ভিডিও, তাঁর ভুলগুলোকে ফোকাস করে বিজ্ঞাপন, ব্লগ, ফেক নিউজ, যা যা ভাবে পারা যায়, তার সামনে নিয়ে এলো ফেসবুক। ভোটারদের সামনে হিলারি ক্লিটনের বিরুদ্ধে নেতিবাচক নানারকম গ্রাফিক্স, পোস্ট, ভিডিও দেখানো হলো। অন্য দিকে দেখানো হল ট্রাম্পের সাফল্য, ট্রাম্পের মহানুভবতা, ট্রাম্পের ক্যারিশ্মা। টেরোরিজ্‌ম্ নিয়ে ছড়ানো হলো ফেক নিউজ। উল্টোদিকে দেখানো হলো, ট্রাম্প কীভাবে টেরোরিজ্‌ম্ দমন করবে! এই ভিডিও, বিজ্ঞাপনগুলোর ট্রেস কেউ জানে না! এগুলো আপনি হয়তো দেখছেন কারণ আপনি তাদের টার্গেট। কিন্তু আমি দেখবো না কোনোদিন, বাদবাকি কেউ জানতেও পারবে না। আপনি স্ক্রল করে এগিয়ে গেলে সেই বিজ্ঞাপন হারিয়ে যাবে, তাদের নূন্যতম কোনো ট্রেস রাখবে না ফেসবুক। কেউ যদি এই ভুয়ো খবর, ঘৃণার পোস্ট ইত্যাদির সোর্স নিয়ে জানতে চায়-ও, খুঁজে পাবে না কোনো উপায়! এই বিজ্ঞাপনগুলি, এই ভিডিওগুলি, পোস্টগুলি কোথা থেকে আসে, কে টাকা দেয় এর পিছনে, এসব জানে শুধুই ফেসবুক, অথচ ফেসবুক কারোর কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নয়! কোনো আইনের কাছেও নয়! ঘৃণার পোস্ট, ভিডিও ঠিক যেমন ভোটের দামামা বাজলেই আপনার ফেসবুকে, হোয়াটস্যাপে নানারকম ফেক নিউজ হিসেবে চলে আসে, আর আপনি প্রথমবার বিশ্বাস না করলেও বারবার একইধরনের খবর, পোস্ট দেখতে

দেখতে একসময় তা বিশ্বাস করতে শুরুও করে দেন।

ধরুন কোনো জায়গার নির্বাচনে ৫০০ জন ভোটার। ধরা যাক, সেখানে খুব অল্প মার্জিনে জেতা হারা ঠিক হয়। ধরুন সেখানে ২০০ জন পার্টি 'ক'-কে ভোট দেবে, ১৫০ জন পার্টি 'খ'-কে, আর বাকি ১৫০ জন 'অতো রাজনীতি বোঝে না', বা রাজনীতিকে পাত্তা দেয় না। তারা হয়তো ভোটের এক সপ্তাহ আগেও ভাবছে কাকে ভোট দেবে। সেই বাকি ১৫০ জনকে টার্গেট করে (তাদের ফেসবুক একাউন্ট থেকে নেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে) দিনের পর দিন এইভাবে ম্যানিপুলেট করে পার্টি 'খ'-এর প্রতি ঝুঁকিয়ে দেওয়া সম্ভব। এর ফলে সেই জায়গার নির্বাচনের ফলাফল সম্পূর্ণ বদলে দেওয়া যায়, সমস্ত বড়ো বড়ো স্ট্যাটিস্টিক্যাল প্রেডিকশনকে নস্যাৎ করে দিয়ে। গণতন্ত্রের হুদ্দুমুদ্দু!

২০১৬ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পের জেতার পিছনে কতটা ব্রেন ওয়াশিং কাজ করেছিলো, তা বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। কারণ কাউকে ভোট দেওয়ার পিছনে নানারকম কারণ থাকে। কিন্তু কেমব্রিজ অ্যানালিটিকার দাবী তাদের এই পদ্ধতিই ট্রাম্পের জেতার অন্যতম কারিগর। কতটা কী প্রভাব ফেলেছিল এই ব্রেন ওয়াশিং পদ্ধতি, এই ঘৃণা-ভয় ছড়ানোর পাশা খেলা, সেই চুলচেড়া বিশ্লেষণ আপাতত দূরে সরিয়ে রাখলেও এ কথা অনস্বীকার্য যে গণতান্ত্রিক নির্বাচন ব্যবস্থায় কেমব্রিজ অ্যানালিটিকা বড়োসড় চিটিং করেছিল। তারা একটা বিশাল সংখ্যক ভোটার-বেসকে ব্রেন ওয়াশ করার চেষ্টা করেছিল। মানুষের মধ্যে মিথ্যা ভয় ও ঘৃণা ছড়িয়েছিল, সর্বোপরি তাদের অনুমতি ছাড়াই তাদের ব্যক্তিগত ডেটা চুরি করেছিল। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নিই অন্তিম ফলাফল চিটিং না করলেও একই হতো, তাহলেও প্রশ্ন রয়ে যায় যে প্রতিযোগিতায় চিটিং করা যায় সেই প্রতিযোগিতার স্বচ্ছতা নিয়ে।

প্রায় একই ঘটনা ঘটে ব্রেক্সিট বিষয়ক নির্বাচনে। যে ভোটের পর ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে ব্রিটেন বেরিয়ে আসে। দুই ধরনের ফেক নিউজের কথা এখানে বলবো, যেগুলো আপনারও হয়তো খুব চেনা ঠেকবে এই NRC-CAA-NPR-এর ভারতবর্ষে। ইংল্যান্ডে নাকি শরণার্থী সংখ্যা প্রচুর বেড়ে যাচ্ছে, কারণ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদস্য অন্যান্য দেশগুলিতে নাকি চাকরি কমে যাচ্ছে, আর তাই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে চাকরি করার অধিকার প্রাপ্ত শরণার্থীরা জীবনযাত্রার সমস্যার কারণে ইংল্যান্ডে পাড়ি জমাচ্ছেন। আরেকটি ফেক খবর যা বিপুল পরিমাণে ছড়িয়েছিল, তুরস্ক নাকি প্রায় ৭৬ মিলিয়ন জনসংখ্যা নিয়ে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন-এ যুক্ত হচ্ছে! এই দুটো খবরই যে ছিলো সম্পূর্ণ মিথ্যা, তা বলা বাহুল্য। অথচ বেশিরভাগ ইংল্যান্ডবাসী এইরকমের খবর দেখে বিশ্বাস করে ব্রেক্সিটের পক্ষে ভোট দিয়েছে।

পরবর্তী অনুচ্ছেদে যাওয়ার আগে একটা উদ্ধৃতি দিতে চাই একজন হুইসেল ব্লোয়ার ক্রিস্টোফার ওয়াইলি-র, যিনি সত্যকে সবার সামনে এনেছিলেন বলেই কেমব্রিজ অ্যানালিটিকার এইসব অনৈতিক কাজকর্মের কথা আমরা প্রথম জানতে পেরেছি। তিনি বলেছিলেন,

> We exploited Facebook to harvest millions of people's profiles. And built models to exploit what we knew about them and target their inner demons. That was the basis the entire company was built on.

এবার দেশে ফেরা যাক

ভারতে ৩৫৫ জন ভারতীয় ফেসবুক ব্যবহারকারী কেমব্রিজ অ্যানালিটিকার একটি অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করেছিলেন। পরে দেখা যায়, তাঁরা এর মাধ্যমে শুধু নিজেদের না, আরও সাড়ে পাঁচ মিলিয়ন ফেসবুক ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত তথ্য কেমব্রিজ অ্যানালিটিকার হাতে তুলে দিয়েছেন। ক্রিস্টোফার ওয়াইলি অভিযোগ করেছিলেন যে ভারতে এই সংস্থাটির অফিস এবং কর্মী রয়েছে এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পার্টি এদের একজন প্রধান ক্লায়েন্ট ছিলো। কেমব্রিজ অ্যানালিটিকার মূল সংস্থা এসসিএল (স্ট্র্যাটেজিক কমিউনিকেশোন্যাল ল্যাবেরোটরিজ্)। The Wire-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, এসসিএল আনুষ্ঠানিকভাবে কেবল ২০১১ সালে ভারতে একটি কাজ করতে শুরু করেছিলো। আলেকজান্ডার ওক্স্ এবং আলেকজান্ডার নিক্স এই সংস্থার পরিচালক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

অন্য দুই পরিচালক অবনীশ কুমার রাই এবং আমরিশ ত্যাগী ২০১১-২০১২-র আগে নির্বাচন সম্পর্কিত কাজ করেছিলেন এবং আরও বলেছেন যে এসসিএল প্রায়শই তাঁদের নির্বাচনের অভিজ্ঞতার জন্য ভারতে দেশীয় ও বিদেশী ক্লায়েন্টদের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। ত্যাগী এবং রাই দুজনেই বলেছিলেন যে এসসিএল এবং নিক্সের সাথে তাঁদের সম্পর্ক ছিল মাত্র সাত থেকে আট বছর আগে (২০০৯-২০১০)।

অবনীশ কুমার রাই প্রকাশ্যে বলেন, এসসিএল ২০০৩ সাল থেকে ভারতে নির্বাচনে কাজ করেছে বলে যে দাবী করা হয়েছে তা 'সম্পূর্ণ মিথ্যা'। ক্রিস্টোফার উইলির দাবী যদিও সম্পূর্ণ উল্টো। উদাহরণস্বরূপ, রাই উল্লেখ করেছেন যে ২০১২ সালের উত্তরপ্রদেশ রাজ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে, ত্যাগী পরিচালিত ওভলেনো বিজনেস ইন্টেলিজেন্স (ওবিআই) বিজেপির কাছে তথ্য সরবরাহ করেছিলো, কিন্তু "এসসিএল যুক্তরাজ্য বা এসসিএল ভারতের এর সাথে কোনও সম্পর্ক ছিল না"। সুতরাং, যতদূর সম্ভব কেমব্রিজ অ্যানালিটিকা এবং এর প্রধান নির্বাহী আলেকজান্ডার নিক্সের ২০১১-২০১২ সালের আগে পর্যন্ত ভারতীয় নির্বাচনের সাথে খুব বেশী সংযোগ ছিল না। যদিও ওভলেনো বিজনেস ইন্টেলিজেন্স আলাদা ভাবে কয়েকটি রাজনৈতিক প্রার্থী এবং কয়েকটি রাজনৈতিক দলের পক্ষে কাজ করেছিল। ইকোনমিক টাইমসের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী ক্ষমতাসীন বিজেপি ২০১৪ সালে দুটি রাজ্যের বিধানসভা ভোটে ওভলেনো বিজনেস ইন্টেলিজেন্সের সাহায্য নিয়েছিল। The Wire-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ওবিআইয়ের ওয়েবসাইটে কংগ্রেস, বিজেপি এবং জেডি(ইউ) কে ক্লায়েন্ট হিসাবে পাওয়া যায়।

তবে, বিজেপি এবং কংগ্রেস উভয়ই দাবী করেছে যে কেমব্রিজ অ্যানালিটিকার সাথে তাদের কোনোপ্রকার যোগাযোগ ছিল না। ২০১৯-এর ভোটে কেমব্রিজ অ্যানালিটিকা কংগ্রেস আর বিজেপি দুজনের কাছেই তাদের সার্ভিসের জন্য আপ্রোচ করলেও তারা কেউই সেই সার্ভিস নেয়নি বলে কংগ্রেস ও বিজেপির তরফে দাবী করা হয়।

মোটামুটি ভাবে এটা বোঝা যাচ্ছে যে একটা গণতান্ত্রিক সিস্টেমকে নাড়িয়ে দেবার মতো ক্ষমতা রাখে এই ডেটা চুরির মতো ঘটনাগুলি। আমাদের তথ্য আমাদেরই ব্রেন ওয়াশড করতে ব্যবহার করতে পারে ফেসবুক।

আর বোঝা গেল, ম্যানিপুলেশন বা ব্রেন ওয়াশিং-এর অন্যতম হাতিয়ার হল ফেক নিউজ। ব্রেক্সিট বা ২০১৬ সালে ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট

নির্বাচন, দুটো ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক স্বার্থে ফেক নিউজ ব্যবহার হয়েছে। অথচ এখনো এর বিরুদ্ধে প্রায় কোনো ব্যবস্থাই নেয়নি ফেসবুক। আমাদের দেশের ফেক নিউজের পরিণাম আরো ভয়ংকর৷ আমাদের তথ্য কতটা সুরক্ষিত ফেসবুকে, সে প্রশ্ন তো থেকে যাচ্ছেই। আরো একটি প্রশ্ন এই যে, ফেসবুককে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে যে ভয় ও ঘৃণা ছড়ানো হচ্ছে, যা মানুষকে প্রভাবিত করছে ক্ষতিকর ভাবে, যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই ক্ষতিকরভাবে প্রভাবিত করছে, তার ভবিষ্যৎ কী?

সাধারণ মানুষ ডেটা প্রাইভেসি সম্বন্ধে তেমন কিছু জানে না, তার জন্যে তাদের এখনই দোষ দেওয়া চলে না। ফেসবুকের মতন এই অ্যাপ্লিকেশনগুলো এমন ভাবেই তৈরি করা হয়, যাতে এর গ্রাহক একে ব্যবহার করার প্রত্যেক মুহূর্তে মনে করেন যে তিনি বিনোদন পাচ্ছেন। যখন ফেসবুক ব্যবহার করা হয়, তখন প্রত্যেক মুহূর্তের ওই বিনোদনে ডুবে থাকার কারণে আমরা নিজেদেরই যেন বা হারিয়ে ফেলি, এতটাই নিজেদের হারিয়ে ফেলি যে সত্যমিথ্যা যাচাই বা আমদের গোপনীয়তার সমস্ত প্রশ্ন আমাদের অগ্রাধিকারে আসে না, এমনকি আমরা সম্পূর্ণ অবজ্ঞাই করে ফেলি সেইসব। স্বভাবতই, এই নতুন যুগের নতুন চাহিদার সাথে তৈরি হয়েছে নতুন সমাজ ব্যবস্থা, নতুন অর্থনীতি, নতুন বাজার। যারা হোয়াটস্যাপে যেকোনো মেসেজ এলে বিশ্বাস করে, ফেসবুকে যেকোনো খবর পড়ে বিশ্বাস করে, তাদের কাছে এই নতুন ডিজিটাল ইন্ডিয়া কতটা সুরক্ষিত?

বর্তমানে এই পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নেই যা ফেসবুককে দমিয়ে রাখতে সক্ষম। কোনো আইনসভা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, কোনও নিয়ন্ত্রক নেই। কংগ্রেস ব্যর্থ হয়েছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ব্যর্থ হয়েছে। কেমব্রিজ অ্যানালিটিকা কেলেঙ্কারীতে ভূমিকার জন্য ফেডারেল ট্রেড কমিশন যখন ফেসবুককে রেকর্ড পাঁচ বিলিয়ন ডলার জরিমানা করে, তার ফলাফল কী ছিল জানেন? তাদের শেয়ার প্রাইস ক্রমশ আরো উর্দ্ধমুখী হয়েছিলো।

এটা মনে রাখা দরকার যে কেমব্রিজ অ্যানালিটিকা কেবল মাত্র এক পরগাছা যা ফেসবুকের মতো উর্বর জমিতে বেড়ে ওঠে। একটি মাত্র পরগাছাকে হয়তো চিহ্নিত করা গেছে, কিন্তু ফেসবুকের মতো সংস্থাগুলির উর্বর জমি বহাল তবিয়তেই রয়ে গেছে। সেখানে যেকোনো নতুন পরগাছা গজিয়ে ওঠার সমস্ত সুবিধা তারা করে রেখেছে।

সার্ভেইলেন্স ক্যাপিটালিজম

আমরা কি আদৌ বুঝতে পারছি এই হলুদ সাংবাদিকতার যুগে, এই ডিজিটাল যুগে আমরা নিজেরাই পণ্য? ক্যাপিটালিজমের এক নতুন দিক Surveillance Capitalism। আমাদের উপর সারাক্ষণ নজরদারি চলছে আমাদের অজান্তে, আমাদের ইচ্ছার তোয়াক্কা না-করেই। যা ব্যবহার করে পার্সোনালাইজ্ড্ বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আমাদের দুর্বল মুহূর্তগুলি, আমাদের আবেগপ্রবণ আচরণগুলিকে পুঁজি বানিয়ে মুনাফার উপর মুনাফা লাভ করছে সিলিকন ভ্যালির টেক-জায়েন্টরা। এ প্রসঙ্গে সবথেকে প্রথমে উল্লেখ্য হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষিকা সোশানা জুবফ-এর লেখা বিখ্যাত বইটি, *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power.* তিনি মার্ক্সীয় সারপ্লাস ভ্যালুর সাথে তুলনা টেনে বলেছেন বিহেভিয়রল সারপ্লাসের কথা। আমাদের অনলাইন জীবনের ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্যগুলির তথ্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত

সংগ্রহ করে নেয় টেক-জায়ান্টগুলি। সেই তথ্যের সাহায্যে, আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপের নজরদারির উপর ভিত্তি করে, প্রেডিকটিভ বিহেভিয়র মডেলিং-এর মাধ্যমে ব্যবসায়ী সংস্থাগুলি পার্সোনালাইজড বিজ্ঞাপনের খসড়া তৈরি করে দিচ্ছে। জুবফ এই নতুন পুঁজিবাদের উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন,

> These data streams, with these rich predictive signals, are fed into the new factories, the computational factories analyzed for predictions of human behavior and these predictions are then sold.
>
> Who are they sold to? They're not sold to us. We are not the customers. They're sold to businesses, to business customers, who want to maximize our value to their business, whatever it may be.
>
> They use information from our faces. We have given billions and billions of photos to Facebook to train models for facial recognition. Those models are then sold to military operations. Some of them are in China, and those Chinese operations do many things including imprisoning the Uighur, a subset of the Uighur Muslim population in China. This is rightly regarded as an open bar prison where they actually don't have to have people behind the bars because they track and follow them constantly through facial recognition.

এই তীক্ষ্ণ নজরদারির সুবিধা নিয়ে কেমব্রিজ অ্যানালিটিকা তৈরী করেছিলো তাদের বিশাল ডেটা পয়েন্ট, কেমব্রিজ অ্যানালিটিকার তৎকালীন সি.ই.ও. আলেকজান্ডার নিক্স-এর কথা অনুযায়ী প্রায় ৫০০০ ডেটা পয়েন্ট, প্রতি আমেরিকান পিছু।

সার্ভেইলেন্স ক্যাপিটালিজমের কথা বলতেই প্রথমে মনে আসে গুগলের কথা। আমরা কমবেশি প্রায় সবাই কোনো না কোনো ভাবে গুগল নির্ভর। আমাদের প্রত্যেকের যে পরিমাণ ডেটা গুগলের কাছে আছে, তা

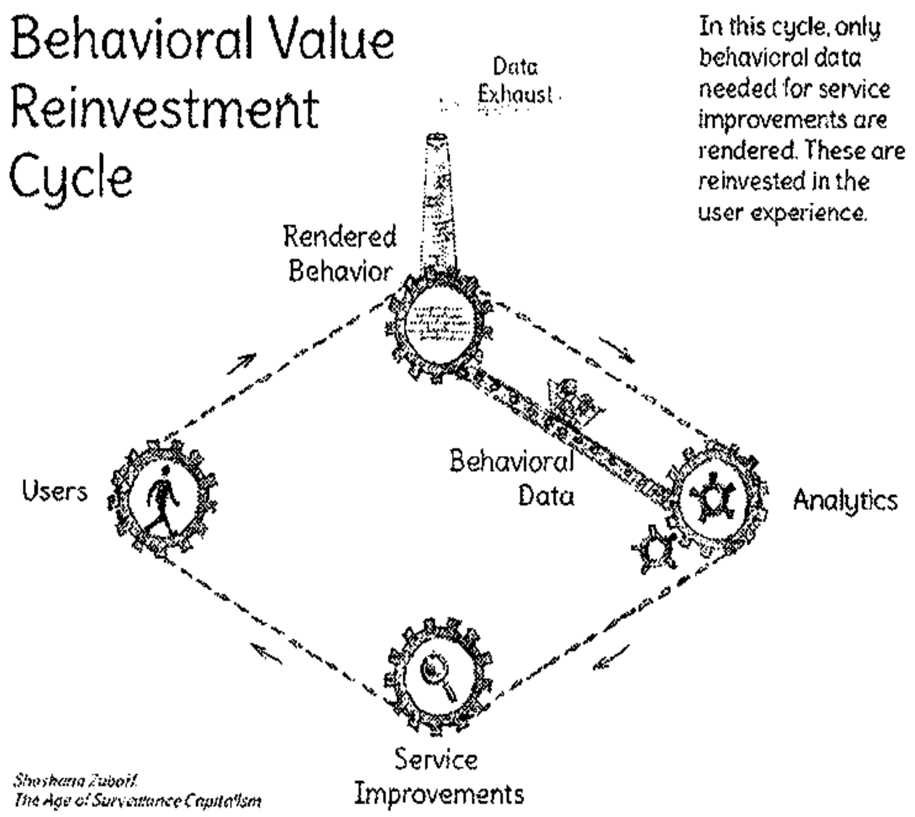

চিত্রঋণ | সোশানা জুবফ

হয়তো সরকারের কাছেও নেই। আমাদের কৌতুহলের জন্য আছে গুগলের সার্চ ইঞ্জিন, যার সাথে হয়তো আমরা আমাদের প্রেমিকার চেয়েও বেশি ইনফরমেশন শেয়ার করি। আমাদের প্রায় সমস্ত ছবিকে নিখুঁতভাবে ফেসিয়াল রেকগনিশনের মাধ্যমে চিনে রাখছে গুগল ফটোজ, আমাদের গলার স্বর চিনে রাখছে গুগল অ্যাসিস্টেন্স, আমাদের প্রতিটা মুহূর্তের লোকেশন শেয়ার হচ্ছে গুগল ম্যাপের সাথে। কোথায় কখন গেলাম, কতো গতিতে গেলাম, সব কিছুই গুগলের নখদর্পণে। আমাদের ভিডিও দেখার প্রেফারেন্স, গান শোনার প্রেফারেন্স, তা দিয়ে আমাদের মুড বিশ্লেষণের সবকিছু সরঞ্জামই আছে গুগলের কাছে। http://www.google.com/settings/ads ওয়েবসাইটটিতে গেলে আপনি আপনার সম্পর্কে ঠিক কতোরকম প্রেডিকটিভ বিহেভিয়র মডেলিং করেছে গুগল, তা টের পাবেন। হয়তো কিছু ডেটা আপনি নিজেই দিয়েছেন গুগলকে। কিন্তু বেশিরভাগ ডেটাই আপনার বিহেভিয়রকে পর্যালোচনা করে পাওয়া। সম্প্রতি গুগল তার নতুন একটা প্রোডাক্ট এনেছিল বাজারে, গুগল নেস্ট। সেটা আদতে একটা সিকিউরিটি ডিভাইস। অতএব, এখন আপনার বাড়িতে যা যা ঘটছে তাও গুগলের কাছে রিয়েল টাইমে আপডেট হতে থাকবে। এই প্রোডাক্টটিতে হঠাৎই একটি মাইক্রোফোন পাওয়া যায়, যেটির উল্লেখ ডিভাইস ডেসক্রিপশনে ছিল না, এর কোনো উল্লেখই গুগল করেনি। পরে গুগল এটি তাদের ভুল বলে স্বীকার করলেও প্রশ্ন ওঠে, কী তাদের উদ্দেশ্য ছিলো? আদৌ কি এটি একটি 'অনিচ্ছাকৃত ভুল'?

আমরা ফেসবুকের যে উর্বর জমিটির কথা বলছিলাম সেটাকেই বলা চলে সার্ভেইলেন্স ক্যাপিটালিজমের জমি। জুবফ তাঁর বইয়ে এই বিষয়ে বিশদে আলোচনা করেছেন।

টিভিতে নানারকম উপায়ে আমাদের বিনোদন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, যাতে আমরা টিভির স্ক্রিনের সামনে বসে থাকি, যাতে আমরা বিজ্ঞাপন দেখি! ফেসবুকের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনে স্পষ্ট বলা আছে "ফেসবুক অথবা এর মধ্যেকার অন্য কোনো পণ্য বা পরিষেবাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা আপনাকে চার্জ করবো না। এর পরিবর্তে, ব্যবসা এবং সংস্থাগুলো আপনাকে তাদের পণ্য ও পরিষেবার বিজ্ঞাপন দেখানোর জন্য আমাদের অর্থ প্রদান করে। ...কোন বিজ্ঞাপন আপনাকে দেখাবো তা নির্ধারণ করতে আমরা আপনার ব্যক্তিগত ডেটা ব্যবহার করি।"

তাহলে এখানে কে পণ্য?

ফেক নিউজ এবং তার প্যাটার্ন

ইদানিং প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনের আগেই আমাদের কাছে হাজার হাজার ফেক নিউজ ভেসে আসে। হয়তো ইন্টারনেট পরিষেবা, তার গতি, ইত্যাদির বিচারে আমরা এখনো আমেরিকা বা ব্রিটেনের মতো আধুনিক নই। নির্বাচনে মানুষের মতামতকে নির্ধারণ ও প্রভাবিত করে দেওয়ার ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের এই যেটুকু খামতি, সেই জায়গাটি ফেক নিউজ ছড়ানোর মাধ্যমে পূরণ করে চলেছে আমাদের প্রিয় টেলিভিশন চ্যানেলগুলি, বিশেষত খবরের চ্যানেল! তবে ভারতে প্রতিনিয়ত ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়ছে। যেখানে ফ্রি কানেক্টিভিটির লোভে মেতে ঢালাও জিও কোম্পানির পরিষেবা নিয়ে এখন সবথেকে বেশি টাকা পকেট থেকে খোয়াতে হচ্ছে, এই যেখানে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের আচরণ, সেখানে ডেটা প্রাইভেসির মতো ব্যাপার মোটেও

হালকা ব্যাপার নয়। বরং গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর মতো সিরিয়াস (অবশ্য গ্লোবাল ওয়ার্মিংকেও কি আমরা সিরিয়াস ভাবে দেখি)!

আমাদের দেশের মোট ডেটা চুরির সংখ্যা এখন প্রায় ৩০০ মিলিয়নের কাছাকাছি, তার থেকেও বেশী হওয়ার সম্ভাবনা, কম তো নয়-ই। ফেক নিউজগুলি কে, কোন উদ্দেশ্যে ছড়াচ্ছে, সেটা কেউ জানে না। যতদূর সম্ভব, জানার কোনও নির্দিষ্ট উপায়ও নেই। তবে ফেসবুক, হোয়াটস্যাপের মতন জায়গাগুলি যে ফেক নিউজের প্রধান প্ল্যাটফর্ম, তা নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই। অর্থাৎ আমাদের ব্যক্তিগত তথ্য চুরি এবং ছড়াতে থাকা ফেক নিউজের কর্মকান্ডের মধ্যে গভীর সংযোগ রয়েছে।

টার্গেট করে বানানো জাল বা বিভ্রান্তিকর সংবাদগুলির প্রকৃত সামাজিক প্রভাব ভয়ঙ্কর। করোনাভাইরাসের লকডাউনের সময় আরো বেশী করে যেন চোখে পড়লো আমাদের যে অনেকসময়েই খবরের নির্ভরযোগ্য উৎসগুলো অবধি ভুল।

টি.আর.পি. আরেকটি মারাত্মক এক বিষয়, যার লোভে জাতীয় স্তরের মিডিয়া অবধি ফেক নিউজ ছড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ওই যে বললাম, যেন তেন প্রকারেণ আপনাকে বসিয়ে রাখতেই হবে স্ক্রিনের সামনে, যাতে আপনি বিজ্ঞাপন দেখতে পান! সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, যখন দেখি বাংলার এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জাতীয় টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচারিতএকটি ফেক নিউজকে ভিত্তি করে বক্তৃতা রাখেন।

একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্ন পাওয়া যাচ্ছে এখন ফেক নিউজে। ২০২০ সালের মার্চ মাসের শেষের দিকে, ৩০ মার্চ থেকে শুরু হওয়া সপ্তাহটিতে, ভুয়ো খবরের সংখ্যা ১৫ থেকে বেড়ে ৩৩-এ পৌঁছেছিলো। দিল্লীর নিজামুদ্দিনে তাবলিগী জামাতের অনুষ্ঠানটি করোনাভাইরাসের মূল কারণ হিসাবে তুলে ধরা হচ্ছিলো প্রধান মিডিয়া রিপোর্টগুলিতে, পরিকল্পিতভাবে। এ হেন কাজ ম্যানিপুলেশন ছাড়া আর কি! ফেসবুক-হোয়াটস্যাপ জুড়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ভয় ছড়িয়ে দেওয়া হাজার হাজার ভুয়ো খবর ছুটছিলো ঝড়ের বেগে, শুধুমাত্র ভারতের সর্ববৃহৎ সাম্প্রদায়িক দলটির ভিত মজবুত রাখতে।

ফেক নিউজকে আঁতুড়ঘর করে কীভাবে ইসলামফোবিয়া ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে গোটা পৃথিবী জুড়ে, নীচের গ্রাফটা দেখলেই সেটা স্পষ্ট হবে।

এছাড়া মুরগির মাংসের দাম কমে যাওয়া, রাস্তায় হাজার হাজার লোক ঘন্টা বাজানো, বাজী ফাটানো, রোজ রোজ নিত্যনতুন করোনাভাইরাসের ভ্যাকসিন বানানো (দেশের অন্যতম বড়ো ব্যবসায়ী সাধুবাবার বানানো করোনিল), এই সবকিছুর পিছনেই আছে ফেক নিউজের মাহাত্ম্য। ফেক নিউজের তালিকায় গোটা লকডাউন-কাল জুড়ে প্রথমে ছিলো

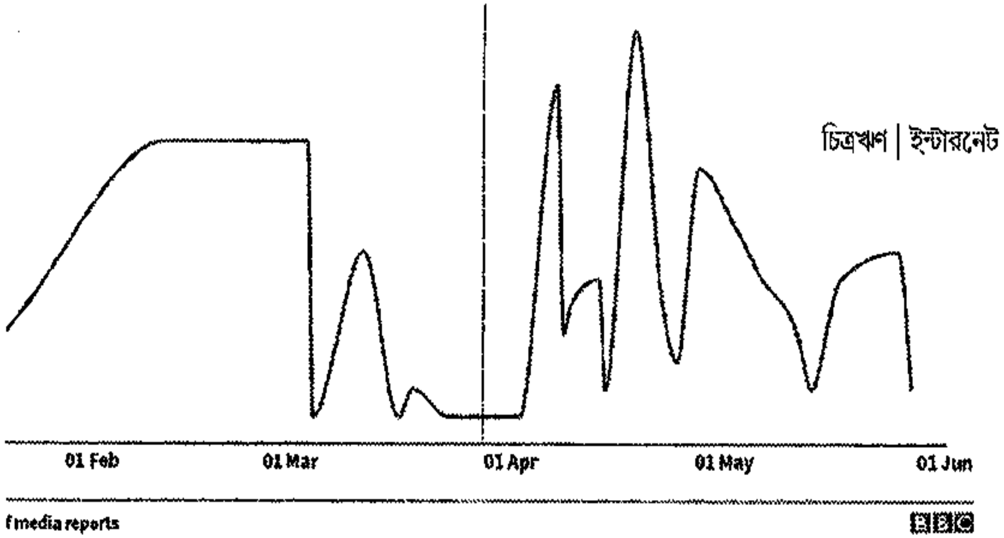

চিত্রঋণ | ইন্টারনেট

করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত খবর।

প্রথমে তো করোনাভাইরাসের উৎস নিয়ে নানারকম মিথ্যে খবর ছড়ানো হলো। ফলস্বরূপ ভারতের মাটিতে ভারতের মানুষদের চীনা বলে গালিগালাজ করা হলো। হিন্দু-মুসলিম বিভেদ সৃষ্টি করেই ফেক নিউজ ক্ষান্ত নয়, তা প্রতিবেশী মানুষের প্রতিও ভয় ও ঘৃণা তৈরী এবং পোষণ করতে সাহায্য করছে।

কথাটা হলো, ফেক নিউজ ছড়ায় কে? কে টাকা দেয় এইরকম সুচারুভাবে ভিডিও তৈরী করার? কে মদত যোগাচ্ছে? ফেসবুকে ইতিমধ্যে ভারতের সর্ববৃহৎ সাম্প্রদায়িক ও খুনি রাজনৈতিক দলটির আইটি সেলের নাম বিখ্যাত, হোয়াট্‌স্যাপ ইউনিভার্সিটির প্রসঙ্গও আমরা জেনে গেছি।

একটা ছোটো উদাহরণ দিই। কয়েকদিন আগেই পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে মানুষজন উতলা হয়ে পড়েছিলো (যদিও সেই উতলাপনা যতোনা পরিযায়ী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও দুর্দশার কথা ভেবে, তার থেকে অনেক বেশি শ্রমিকদের মাধ্যমে ভাইরাস ছড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে)। সরকারি এবং অন্যান্য খবরের চ্যানেলে প্রথমে এই নিয়ে খবরের সংখ্যা অনেক কম ছিলো। তারপর কেন্দ্রীয় সরকার যখন ঘোষণা করলো বাড়ি ফিরতে চাওয়া শ্রমিকদের রেলভাড়ায় ৮০% ছাড় দেওয়া হবে, সেই খবরটি চারিদিকে ছড়িয়ে গেলো। অথচ আমরা জানি, কেউ-ই এই ছাড় আদতে পাননি। তারপর খবরের চ্যানেলগুলিতে খবর পরিবেশন করা হলো ঠিক এই ভাষ্যে, "পরিযায়ী শ্রমিকদের ট্রেন যে যে জায়গায় ঢুকছে সেখানে করোনা ভাইরাসের প্রকোপ বাড়ছে।" এই ভাষ্যে খবর পড়া হলো বারবার, বিভিন্ন চ্যানেলে। প্রশ্ন তোলা হলো না, কেন তারা বাইরে ছিলো এতোদিন? কেন তাদের ফেরানো হয়নি

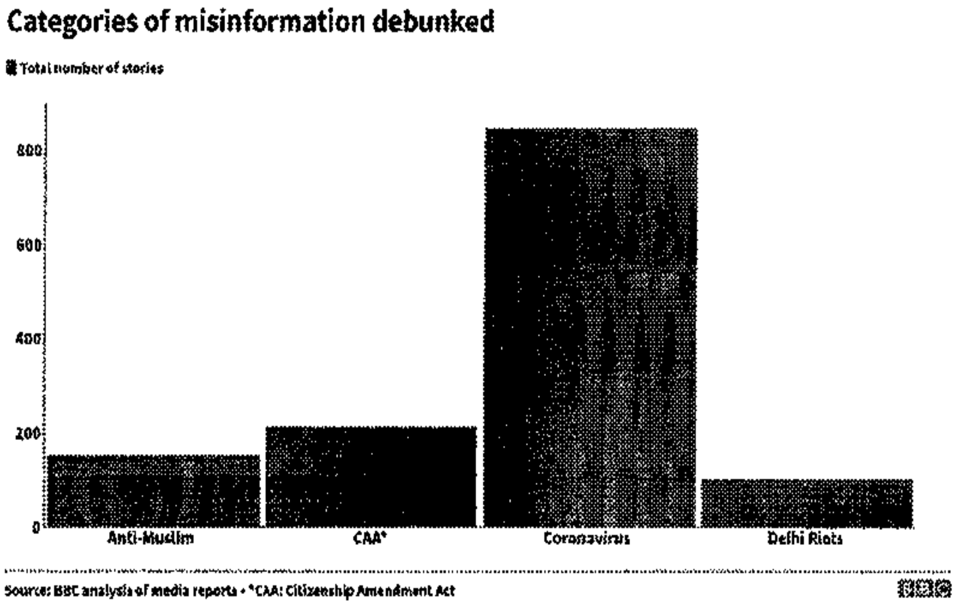

চিত্রঋণ | ইন্টারনেট

আগে, যখন এই ভাইরাসের প্রকোপ কম ছিলো? কেন মানুষকে কাজের সন্ধানে প্রাণ হাতে করে অন্য অন্য জায়গায়, দূরে দূরে পাড়ি জমাতে হয় ভিটেমাটি পরিবার-পরিজন ছেড়ে?

বিষয়ভিত্তিকভাবে এটা হয়তো কিছু ক্ষেত্রে সত্যি যে করোনার প্রকোপ সময়ে সময়ে বিভিন্ন এলাকায় বেড়েছে। কিন্তু তার কারণ ঘরে ফেরা পরিযায়ী শ্রমিকেরাই কি না, সেটা জানা সম্ভব একমাত্র বৈজ্ঞানিক উপায়ে গবেষণা করলে। সেরকম কোনো কিছুই সরকার থেকে করা হয়নি। উল্টে, সত্য বিকৃত করে এমন ভাষ্য খাড়া করা হলো, যেটা শুনে খুব স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষের মনে পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রতি জাগবে ভয়। তৈরী হয় বিভেদ!

এইসব তো সামান্য একটা অংশ। গত নির্বাচনে যে পরিমাণ

ফেক নিউজ ছড়ানো হয়েছিলো, তার তুলনায় এইসব তুচ্ছ। আরও কত এরকম খবর চারিদিকে কীভাবে ছড়িয়ে আছে, কেমনভাবে মানুষের মাথায় সত্যি খবর হিসেবে আশ্রয় নিয়ে আড়েবহরে বেড়ে চলেছে, তা আন্দাজ করাও কঠিন। স্বভাবতই, আমরা এসে উপস্থিত হই আমাদের তোলা সেই আগের প্রশ্নটিতে— এগুলোতে মদত দিচ্ছে কে? হোয়াটস্যাপ ইউনিভার্সিটি বা আই.টি. সেলের কোনো কিছুই তো অফিসিয়াল নয়, তাহলে এসবের পিছনের ফান্ড আসছে কোথায়? প্রশ্ন ওঠে ফেসবুক, হোয়াটস্যাপ এইগুলো মানুষকে কানেক্ট করার জন্য, না কি মানুষের মধ্যে ঘৃণা, ভয় ছড়িয়ে বিভেদ তৈরি করার জন্য? প্রশ্ন ওঠে এই এতো পরিমাণে ফেক নিউজকে কীভাবে পুশ করছে ফেসবুক? তাদের অ্যালগোরিদম কীভাবে কাজ করে? কেন রাজনৈতিক বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না এই বিশাল বিশাল টেক-জায়েন্টরা? প্রশ্ন ওঠে, এই বিশাল বিজ্ঞাপন, ফেক নিউজ কি তাহলে নির্দিষ্ট মানুষদের টার্গেট করে ছড়ানো হচ্ছে রাজনৈতিক লাভের জন্য? আমরাও কি ম্যানিপুলেশনের স্বীকার? আমাদেরও কি ব্রেন ওয়াশ করা হচ্ছে? আমাদের ডেটাও কি চুরি হচ্ছে?

ডেটা-চুরির রাজনীতি এবং ফেক নিউজ

প্রশ্ন অনেক। ভয়ঙ্করভাবে এ কথা সত্য যে বর্তমান কেন্দ্রীয় শাসক দল ফেক নিউজকে ইন্ধন যোগাচ্ছে। The Print-এর একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রায় ১৮০০০ ট্যুইট অ্যাকাউন্ট থেকে বিজেপির সাপোর্টে ফেক নিউজ ছড়ানো হয়। কংগ্রেসের সাপোর্টে ১৪৭টি এইরকমের ট্যুইট অ্যাকাউন্ট রয়েছে। বিজেপির নানা মুখপাত্রকেও ভুল খবর ছড়াতে দেখা গেছে, এমনকি কেন্দ্রীয়

চলতি সমস্ত নিউজ মিডিয়াই ভুয়ো খবরের খপ্পরে পড়ে/ভুয়ো খবর প্রচার করে (বিশদ পরের পৃষ্ঠায়)

চিত্রঋণ | ইন্টারনেট

প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় অবধি। জাতীয় খবরের চ্যানেলগুলোও মারাত্মকভাবে দায়ী ফেক নিউজের উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য। ANI, Times Of India, Kochi, TV9, Global Times, OPIndia, News18, ইত্যাদিদের মতন বিখ্যাত এবং নির্ভরযোগ্য মিডিয়ার নামও আসে ভুয়ো খবর ছড়ানোর তালিকায়। রিপাবলিক টিভির নাম না হয় ছেড়েই দিলাম, তারা ওই তালিকায় সবসময়েই শীর্ষে থাকে। করোনা নিরাময়ের জন্য 'গোমূত্র' বা গরুর প্রস্রাব সম্পর্কিত ভুয়ো খবর যে হারে ছড়িয়েছিল, সাধারণ কান্ডজ্ঞান সম্পন্ন চিন্তাধারাইয় তা নিয়ে বিচার করা যাবে না, ওগুলো সেইসবের উর্দ্ধে। আরেক সঙ্ঘ-পরিচালিত সাম্প্রদায়িক সংগঠন 'অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা' জাতীয় রাজধানীতে এমনকি একটি 'গোমূত্র' পানীয় পার্টি আয়োজন করেছিলো। প্রায় ২০০ জন অংশগ্রহণকারী গরুর প্রস্রাব পান করেছিলো এবং ভাইরাসের ভ্যাকসিন হিসাবে তারা গোবর, প্রস্রাব, দুধ, দই এবং ঘি দিয়ে তৈরি শরবৎ সেবন করেছিলো। হাস্যকর না দুঃখজনক, কীভাবে এই ঘটনার ব্যাখ্যা হয় তা আমাদের জানা নেই। এইরকমের গোমূত্র পার্টি কলকাতা সহ অন্যান্য রাজ্যেও হয়েছিলো। কিছু জায়গায় গরুর প্রস্রাব পান করানো ব্যক্তিরা বমি বমি ভাব নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি এবং মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলো। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি নেতা নারায়ণ চ্যাটার্জীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিলো এইরকমের একটা গোমূত্র পার্টি আয়োজন করার অপরাধে।

যা যা আমাদের চিন্তাধারাকে হাজার বছর পিছিয়ে দেয়, আমাদের সাধারণ বিজ্ঞানমনস্কতা এবং কান্ডজ্ঞানকে চুরমার করে দেয়, মানুষকে ভুল পথে চালনা করে, অসুস্থ করে, মানুষে মানুষে বিভেদ জাগিয়ে তোলে, সেইরকম প্রতিটি বিষয়ের প্রতিই কীভাবে একটি 'কল্যাণকামী রাষ্ট্রের' শাসক দলের সমর্থন থাকতে পারে, তা বিচারসাপেক্ষ। জাতীয় খবরের চ্যানেলগুলো, যেগুলোর মধ্যে কয়েকটি 'প্রগতিশীল' বলে আমাদের ধারণা, তারাও কেমন নির্লজ্জভাবে ভুয়ো খবর প্রচার করে, তার একটা নমুনা দিয়ে এই অনুচ্ছেদ শেষ করবো। খবরে ঢালাও করে প্রকাশিত হওয়া ৩৩৫০ টন সোনার বদলে যখন প্রকৃতপক্ষে মাত্র ১৬০ কেজি সোনা মিলেছিলো উত্তরপ্রদেশে, তখন The Hindu, Scroll, India Today, News18-এর মতো তথাকথিত 'প্রগতিশীল' সংবাদপত্রগুলি কোথায় মুখ লুকিয়েছিলো? আমাদের জানা নেই।

রাষ্ট্র-কর্পোরেট আঁতাত পরিচালিত ফেক নিউজ এবং ডেটা-চুরির কারবার: আমাদের মনস্তত্ত্ব এবং গণতন্ত্র

আমরা প্রায় সবকিছুই যাচাই না করে শেয়ার করি হোয়াটস্যাপ আর ফেসবুকে। যা ইন্টারনেটে বা কম্পিউটার/মোবাইলের স্ক্রিনে পড়ি বা দেখি, তাই বিশ্বাস করি, তাকেই বেদবাক্য বলে মানি। আমরা সঠিক প্রশ্ন ভুলে গিয়ে ক্যারিশ্মায় মেতে থাকা এক জাতিতে পরিণত হচ্ছি ক্রমশ, এটা অস্বীকার করার জায়গা নেই খুব একটা।

ফেক নিউজের সবচেয়ে বড় আশ্রয়স্থল হলো আমাদের অন্তরের অনিশ্চয়তা, দ্বিধা, ভয়। আমাদের না-জানা, অল্প-জানা, জানার প্রতি বিতৃষ্ণা ও ফাঁপা দেখনদারির জীবনের রসে অতি যত্নে লালিত হয়েছে এই ফেক নিউজ কালচার। আমরা এখন তিরিশ সেকেন্ডের টিকটক ভিডিও দেখে খুশি, আমরা ইনশর্টে দুশো শব্দের খবর পড়তে অভ্যস্ত। আমরা ক্লিকবেটে বারবার ঠকি, কারণ আমাদের জীবন ক্লিকবেটের আহ্লাদেই সুখী। আর, আমাদের

কাছে ওইভাবেই বেঁধে দেওয়া হয়েছে সুখের সংজ্ঞা।

আমাদের ভয়কে আশ্রয় করে গড়ে উঠছে এক মাল্টি বিলিয়ন ডলার ইন্ডাস্ট্রি। আমাদের ভেতরের সুপ্ত ঘৃণাকেই প্রতিফলিত করে লাভ করে নিচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলি, কর্পোরেট সংস্থাগুলি।

২০১৯ সালের প্রতিবেদন অনুসারে ভারতে ৪৫১ মিলিয়ন সক্রিয় ইন্টারনেট ব্যবহারকারী রয়েছে এবং ৪০০ মিলিয়ন হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারী। বিশ্বে যেকোনও দেশের তুলনায় ভারতেই ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। আমাদের ব্যাক্তিগত জীবনের প্রতি মুহূর্তের তথ্য আমরা বিলিয়ে দিচ্ছি হেলায়, শুধুমাত্র একটু ফ্রি বিনোদনের জন্য। এখন ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ সবই এক ছাতার (পড়ুন, ফেসবুক) তলায়। আর ফেসবুক কতোটা বিশ্বাসযোগ্য? সেই সত্যি গল্প আমরা আগেই আপনার সামনে উপস্থিত করেছি।

আমি যখন এই খসড়াটা তৈরী করছি (জুন-জুলাই ২০২০), তখন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সিআরপিএফ, বিএসএফ, সিআইএসএফ, আইটিবিপি এবং এনএসজি সহ সকল সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনীকে, এবং পাশাপাশি প্রাক্তন সেনা সদস্যদের ফেসবুক ব্যবহার নিষিদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে। কয়েকদিন আগেই চীনা অ্যাপ্লিকেশন বলে বেশ কয়েকটি অ্যাপ্লিকেশনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আমরা জাতীয়তাবাদের ধুয়ো তুলে চীন বয়কটের ডাকও দিয়েছিলাম তখন। আসলে ডেটা সুরক্ষার জন্যই সেই অ্যাপ্লিকেশনগুলো ব্যান করা হয়েছিলো, অন্তত এমনটাই দাবী রাষ্ট্রের। কেউ কেউ আবার এটাকে 'জাতীয়তাবাদের একটা ভালো দিক' হিসাবে চিহ্নিত করতে উদ্যত হতে পারে। কিন্তু চীনা অ্যাপ্লিকেশনগুলির তুলনায় লক্ষ-কোটিগুণ ডেটা বন্দী হয়ে আছে আমেরিকান গুগল, বা ফেসবুকের কাছে। এই তথ্যই প্রমাণ করে দেয়, রাষ্ট্রের বলা ডেটা-সুরক্ষা সম্পর্কিত যাবতীয় সুললিত কথা আসলে ফেক নিউজের মতোই ফোঁপড়া, একশো শতাংশ গিমিক।

কেমব্রিজ অ্যানালিটিকার কেলেঙ্কারির পর ২০১৮'র নভেম্বরে বৃটিশ সংসদ আরো নয়টি জাতীয় সংসদের সাথে ফেসবুকে ফেক নিউজ ছড়ানো সংক্রান্ত তদন্তে মার্ক জুকারবার্গকে যখন ডেকেছিলো, তখন জুকারবার্গ আসেননি। জুকারবার্গ সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করার পরে, ১৮ই ফেব্রুয়ারী ২০১৯ তারিখে বৃটেন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে ডিজিটাল যুগে যুক্তরাজ্যের নির্বাচনী আইনগুলি আর উপযুক্ত নয়। জাতিসংঘের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মায়ানমারের রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও হিংসা প্রচার করতে ফেসবুক একটি "নির্ধারক ভূমিকা" পালন করেছে।

আচ্ছা, আমাদের ভারত সরকারের অবস্থান কোথায় এই এতোকিছুর মধ্যে? আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা কি আমাদের তথ্যের মৌলিক অধিকার মান্য করে?

কে. এস. পুত্রস্বামী বনাম ভারত যুক্তরাষ্ট্র মামলার ক্ষেত্রে ভারতের সুপ্রীম কোর্ট (২০১৭) ভারতের সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদের অধীনে নাগরিকের গোপনীয়তার অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে মান্যতা দিয়েছিলো। পার্সোনাল ডেটা প্রোটেকশন বিল ২০১৯, সংসদে ১১ ডিসেম্বর ২০১৯'এ প্রবর্তিতও হয়েছিলো। এটি একটি ডেটা প্রোটেকশন অথরিটি (ডিপিএ) তৈরি করে, যার উপরে ডেটা সুরক্ষার সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের স্বার্থ নিয়ন্ত্রণের ভার দেওয়া হয়।

কিন্তু এখানেও ছিল কারসাজি। বিলের ৩৫ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা আছে, কেন্দ্রীয় সরকারকে বা কেন্দ্র পরিচালিত যেকোনো সংস্থাকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা এবং সুরক্ষা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতিতে এই আইন থেকে ছাড় দেওয়া যাবে। কার্যকরভাবে, বিলের সামগ্রিক ক্ষেত্র থেকেই কেন্দ্রীয় সরকারকে বাইরে সরিয়ে দেওয়ার একটি পরিকল্পনা এটি। বিলটির ৩৫ নম্বর অনুচ্ছেদের এই ব্যতিক্রম সরকারকে ছাড় দিচ্ছে, অতএব এই ব্যাতিক্রম ডিপিএ-র বিচার বিভাগীয় ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ণ করছে। অথচ তথ্যপ্রমাণ, স্বচ্ছতা, এবং সাধারণের স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অনুশীলনবিধি তৈরি করার জন্যই ডিপিএ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল!

একটি বাছাই কমিটির সুপারিশ অনুসরণ করে ডিপিএ-র সভাপতি এবং সদস্যের দলটিকে নিযুক্ত করে কেন্দ্রীয় সরকার। তবে সেই বাছাই কমিটিটি মূলত অসামরিক কর্মচারীদের সমন্বয়ে গঠিত, যাদের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদের সচিব অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই কমিটির সদস্যদের নিয়োগ ও অপসারণের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই রইলো।

বিলের ৮৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার পর্যায়ক্রমে ডেটা সুরক্ষা নির্দেশনা জারি করতে পারে যা 'ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার স্বার্থ, রাষ্ট্রের সুরক্ষা এবং বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বা জনশৃঙ্খলা'-র সাথে জড়িত। এটি ডিপিএ-র উপর বাধ্যতামূলকভাবে কার্যকরী হবে। যদিও ডিপিএ তার মতামত প্রকাশের অধিকারী, কিন্তু চূড়ান্ত বক্তব্য রাখার ক্ষমতা কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই রয়ে গেলো বিল-টির মারপ্যাঁচে। এটি ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার যে কীভাবে ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে করতে চূড়ান্ত জায়গায় পৌঁছে গেছে, তার প্রতিফলন ঘটায়। ঠিক যেমন ইউ.এ.পি.এ বিল, যা কেন্দ্রীয় সরকারকে সম্পূর্ণ অধিকার দেয় কেবলমাত্র সন্দেহের বশে যেকাউকে যখনখুশি অ্যারেস্ট করতে এবং জামিন-অযোগ্য ধারায় জেলের ভিতরে চালান করে দিতে। ক্ষমতা যখন পুঞ্জীভূত হতে শুরু করে একটি অথোরিটির হাতে, তখন গণতন্ত্রের বোলবোলার চাদরের আড়ালে একনায়কতন্ত্রের জন্ম ঘটে অবশ্যম্ভাবীরূপে। এতক্ষণের আলোচনায় বোঝা গেলো যে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে আমাদের উপর নজরদারি চালানোর। আইনত তাকে বাধা দেবার কেউ নেই। অতএব শুধু কর্পোরেট সংস্থা নয়, আমাদের মৌলিক অধিকার আমাদের রাষ্ট্রের কাছেও সুরক্ষিত নয়।

আমাদের সরকার বাহাদুরের নজরদারি

যেকোনো ধরনের নজরদারি আমাদের স্বাধীন ভাবনাচিন্তার পক্ষে ক্ষতিকারক। সরকারকে বারবার দেখা গেছে তার নিজের স্বার্থে এই সমস্ত নজরদারির কৌশলগুলি ব্যবহার করতে, যা তাকে নিশ্চিত করবে কোনো বিরুদ্ধ মতবাদ, কোনো সরকার বা রাষ্ট্রবিরোধী মতবাদ যেন মাথাচাড়া না দিয়ে উঠতে পারে। অথচ এই গর্হিত গণতন্ত্র-বিরোধী ব্যাপারগুলিকেই জনগণের দরবারে মান্যতা দেওয়ার পরিকল্পিত কাজগুলি চলছে, জাতীয়তাবাদের মোড়কে সেগুলি ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে চারিদিকে। সংখ্যাগুরু জনগণ মেনেও নিচ্ছে সমস্তটা। জনগণের ডিজিটাল-অবজ্ঞা, ডিজিটাল-অজ্ঞতা, এবং তলিয়ে-না-ভাবার মনস্তত্ত্বকে মূলধন করে শুধু কর্পোরেট সংস্থা নয়, রাষ্ট্রও জনগণের স্বার্থের বিপরীত আচরণ করে চলেছে।

সরকার পোষিত নজরদারির প্রথম প্রমাণ হিসাবে আসে আধার

সংযুক্তিকরণ। প্রথমত, ২০১৫তে সুপ্রীম কোর্ট এটা পরিষ্কার করে বলেন যে আধার কার্ড রেশন, MGNREGS, LPG, পেনশন ফান্ড (EPF), জনধন যোজনা ছাড়া যেকোনো পরিষেবার সাথে সংযুক্ত করা বাধ্যতামূলক নয়। অথচ আমরা দেখবো, কেন্দ্রীয় সরকার এটিকে নানা বিষয়ের সাথে সংযুক্ত করার জন্য বাধ্য করেছে নাগরিকদের। মোবাইল সিম কেনার সময় আধার সংযুক্তিকরণ বাধ্যতামূলক নয় 'মহামান্য সর্বোচ্চ আদালতের' রায়েই। তাও কেন সরকারের প্রচারে আমরা প্রায় বাধ্য হলাম আমাদের সমস্ত ডেমোগ্রাফিক ও বায়োমেট্রিক তথ্য কর্পোরেট সংস্থাগুলির হাতে তুলে দিতে? আরেকবার মনে করিয়ে দিই, পার্সোনাল ডেটা প্রোটেকশন বিল ২০১৯-এর ৩৫ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আধারের সমস্ত তথ্য, অর্থাৎ আমাদের সমস্ত ডেমোগ্রাফিক এবং বায়োমেট্রিক তথ্য, কেন্দ্রীয় সরকার কাউকে কোনো জবাবদিহি ছাড়াই, কোনোরকমের কারণ ব্যাখ্যা ছাড়াই ব্যবহার করতে পারে তাদের নিজেদের স্বার্থে। "জাতীয় নিরাপত্তা"-র কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা হয় না। তাই সরকারেরও দরকার পড়বে না কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যার, যখন তারা এই সমস্ত তথ্য নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করবে। সরকার সর্বক্ষমতাময়, সরকার সর্বজ্ঞানী। তাই,

> ...dissent becomes treason. Freedom of belief and faith becomes jihad. Inclusion becomes appeasement. Questioning becomes sedition. Compassion becomes weakness. Coercion becomes discipline. Autocracy becomes decisiveness. Violence becomes tough love. And a snooping app (Aarogya Setu) becomes a tool for "digital immunity".

(copied from a scroll article by Kalyani Menon Sen)

আমাদের ডেমোগ্রাফিক ডেটায় সন্তুষ্ট না থেকে সরকার বাহাদুর এবার আমাদের ব্যবহারিক ডেটাও সংগ্রহে নামছেন। হাতিয়ার করেছেন করোনাভাইরাসের জন্য সামাজিকভাবে তৈরী হয়ে যাওয়া মানুষের ভয়কে। যদিও আইনত এবং নৈতিকভাবে ভুল, তাও সরকার বাহাদুর আমাদের নানাদিক থেকে চাপ দিতে থাকলেন আরোগ্য সেতু অ্যাপ্লিকেশনটি ব্যবহারের জন্য। আমার hp কোম্পানির ল্যাপটপটি খারাপ হয়েছিলো এক সপ্তাহ আগে, সার্ভিস সেন্টারে যোগাযোগ করাতে তারা সাহায্য করলো। একদম

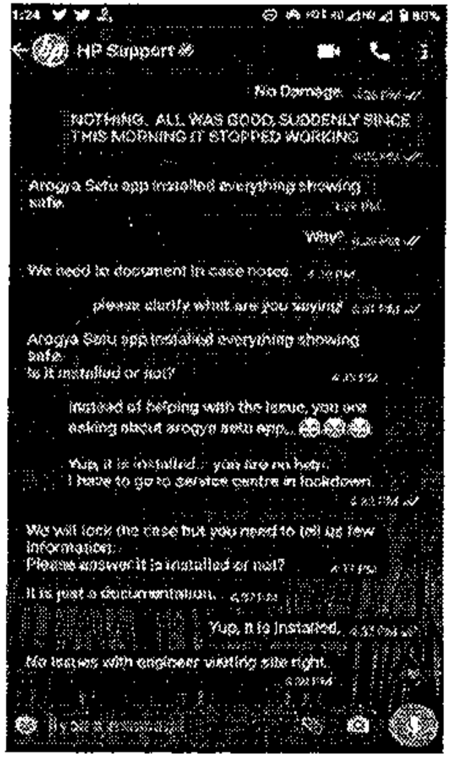

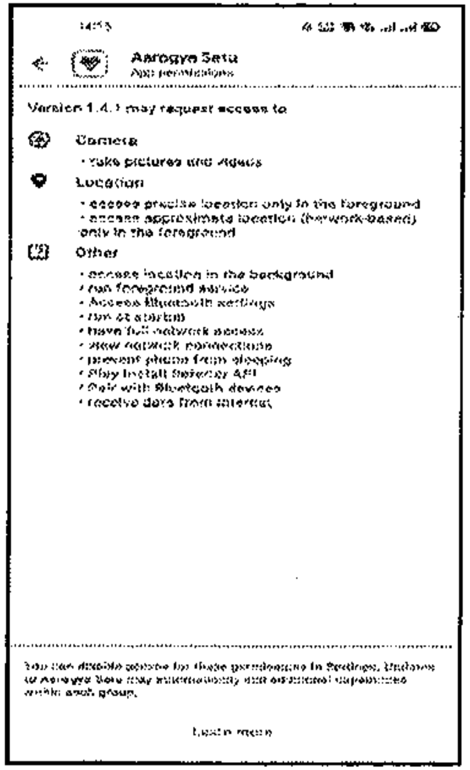

hp-র সাথে কথোপকথনের স্ক্রিনশট এবং আরোগ্য সেতুর তথ্যচুরি

শেযে এসে জানতে চাইলো আমার কাছে আরোগ্য সেতু অ্যাপ্লিকেশনটি ইন্সটল করা আছে কি না! ল্যাপটপের সমস্যার সাথে আরোগ্য সেতুর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে না পেরে আমি প্রশ্ন করলাম। কী জবাব এলো তা এই স্ক্রিনশটেই দেখে নিন। আরোগ্য সেতু ইন্সটল আছে কি না জানার পর তারা জানতে চাইলো আমার বাড়িতে কেউ করোনা আক্রান্ত কি না, জানতে চাইলো আমি বাইরে ঘুরতে গেছিলাম কি না কিছুদিন আগে। তারপর সমাধান দিলো যে একজন ইঞ্জিনিয়ার পাঠানো হবে আমার বাড়ি।

প্রশ্ন ওঠে, কী এমন বাধ্যতামূলক পরিস্থিতি যে আরোগ্য সেতু ইন্সটল করা নিয়ে এতোটাই কড়াকড়ি? ওরা কি আরোগ্য সেতুর ডেটা সরকারের কাছ থেকে নেবে আমার সম্পর্কে জানার জন্য? আরোগ্য সেতু আমার ফোনের লোকেশন, ব্লুটুথ সহ আরও নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করে। এগুলো কি সরকার আমার অনুমতি ছাড়াই এই থার্ড পার্টির সাথে শেয়ার করবে? আর যদি শেয়ার নাই করে, তাহলে এতো জবরদস্তি কেন?

কেন সরকার এতো জবরদস্তি করে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এই অ্যাপ্লিকেশনটির ব্যবহার বাধ্যতামূলক করলো? কেন বার বার বিজ্ঞাপনে, খবরে এই অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করতে জোর দিচ্ছে সরকার?

আমি কোন অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করবো, কোনটি করবো না, তা কি সম্পূর্ণভাবে আমার মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে না? কারণ প্রতিটি অ্যাপ্লিকেশন তার পছন্দমতন আমার ডেটা ট্র্যাক করে। কোনও মহামারীর সুযোগ নিয়ে সরকার যদি আমাদের মৌলিক অধিকারগুলি নিয়ে ছেলেখেলা করে, তাহলে মহামারী-উত্তর সময় কতোটা সুরক্ষিত আমাদের বেঁচে থাকার জন্য?

আরোগ্য সেতু নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছে। সংক্রামক মহামারী থেকে সতর্ক হবার জন্য প্রায় সব দেশেই কনট্যাক্ট-ট্রেসিং অ্যাপ্লিকেশনের আমদানি হয়েছে এই কয়দিনে, যা বেশিরভাগই সরকার দ্বারা চালিত। উপরে উপরে দেখলে, ভালো উদ্যোগ। কিন্তু উদ্যোগ দেখতেশুনতে যতোখানি 'মহৎ', তার বাস্তব ব্যবহার ততোখানিই ধূর্ত। চীনের মতো কিছু দেশ মহামারীর সুযোগ নিয়ে তার প্রতিটি নাগরিকের চলন-বলন সবকিছুই নজরদারি করতে লাগলো। ভারতও পিছিয়ে নেই। প্রথমত, অধিকাংশ দেশে এটির ব্যবহার নাগরিকের স্ব-ইচ্ছার উপরে নির্ভরশীল হলেও ভারতে এটিকে বাধ্যতামূলক করার চেষ্টা করা হয়েছে। ঠিক কতো পরিমাণে তথ্য এটি ব্যবহার করবে তা নিয়েও সন্দেহ জাগে। কিছু সীমিত তথ্য, যা কেবলমাত্র এই সময়েই ব্যবহার হবে অন্য সময় হবে না, তা নিয়ে কোনো নিশ্চয়তা দেয় না সরকার। যেকোনো একটি সেন্সর লোকেশন অথবা ব্লুটুথ ডেটাই যথেষ্ট আমাদের 'প্রক্সিমিটি ট্র্যাকিং'-এর জন্য। কিন্তু আরোগ্য সেতু দুটোই ব্যবহার করে। এবং এটি শুধু 'দরকারী' ডেটা নয়, আরো উদ্বৃত্ত ডেটাও সংগ্রহ করে, ঠিক যেমন ফেসবুক বা গুগলের মতো সংস্থাগুলো বিহেভিয়রাল সারপ্লাস সংগ্রহ করে। শুধু ব্লুটুথ না, তারা সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেস করে, নেটওয়ার্ক কানেকশন অ্যাক্সেস করে, এবং ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহ করে (এই বিষয়ে কোনও নির্দিষ্ট ডেটার উল্লেখ নেই; ফলত সাধারণভাবে আপনি ইন্টারনেটে যা যা ডেটা ব্যবহার করেন তার সবকিছুই এই অ্যাপ্লিকেশনটি ব্যবহার করতে পারে বলে ধরে নিতে হবে)। এই সমস্ত তথ্য ভারতীয় সরকার ও কিছু এজেন্সি ব্যবহার করতে পারে। এজেন্সির ক্ষেত্রে তারা ৩০ দিনের পর আইনত ডেটা ডিলিট করতে বাধ্য। কিন্তু সরকারের ক্ষেত্রে? এটাও বলা হয়েছে যে থার্ড

পার্টির ক্ষেত্রে ডেটা শেয়ার করার সময় তা বেনামে করা হবে। কিন্তু সেটি কীভাবে করা হবে, কাদের কাদের সাথে করা হতে পারে, কী তার নিয়ম, কী তার কানুন, তা নিয়ে কোনও বক্তব্য নেই! সবটাই মন কি বাতের মতো ভাসা ভাসা। যদিও ৩০ দিনের টাইমলাইন রাখা হয়েছে ডেটা ডিলিট করার জন্য, কিন্তু না বিশেষজ্ঞ, না একজন সাধারণ ব্যক্তি, কারোর কাছেই কোনো সুযোগ নেই তার ডেটা ডিলিট হয়েছে কি না তা জানার। অর্থাৎ এখানেই ব্যক্তি তার নিজের ডেটার উপর থেকে নিজের নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে, যা ডেটা প্রাইভেসির ভিত্তি। আমাদের প্রধানমন্ত্রী যতোই টিভির সামনে এসে আরোগ্য সেতুর গুণগান করুন না কেন, শেষের পাতে তিনি ও তাঁর সরকার হাত ধুয়ে ফেলেছেন। আরোগ্য সেতুর টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনে স্পষ্ট বলা আছে কোনো ধরনের ডেটা চুরির ঘটনা বা অ্যাপ্লিকেশনটির যথাযথতা নিয়ে সরকার কোনোরকম দায়িত্ব গ্রহণ করবে না (https://economictimes.indiatimes.com/tech/software/legal-experts-point-out-liability-concerns-with-the-aarogya-setu-app/articleshow/75561944.cms)।

আমাদের তথ্যের ব্যবহার আমাদেরকেই ম্যানিপুলেট করে একটি নির্বাচনকে পর্যন্ত প্রভাবিত করতে পারে, তা এমনই শক্তিশালী। উপরন্তু আমাদের ডেটা সংগ্রহ করে কর্পোরেট সংস্থাগুলি মুনাফার ওপর মুনাফা কামিয়ে যাচ্ছে। তারপরও, সরকার অবধি, আমাদের উপর সারাক্ষণ নজরদারি করতে ব্যস্ত। আমরা ক্রমশ এমন একটি সময়ের দিকে ঝুঁকছি যেখানে কাউকে বন্দি রাখার জন্য জেলখানার গরাদ দরকার হবে না, কানেক্টিভিটির স্বপ্ন দেখিয়ে আমাদের ভার্চুয়াল গরাদে আটকে রাখার সমস্ত ব্যবস্থাই তাদের কাছে আছে। সবসময় আপনার ঘাড়ের উপর নিশ্বাস ফেলবে পুঁজিপতি সংস্থাগুলো যাদের কাছে আপনি কেবলই পণ্য, আপনার ব্যক্তিগত জীবন যাদের কাছে বাজার, আপনার ঘাড়ের উপর নিশ্বাস ফেলবে 'কল্যাণকামী রাষ্ট্র', যারা আপনার প্রতিটি মুহূর্তের উপরে নজরদারি চালিয়ে সুনিশ্চিত করবে রাষ্ট্রের স্বার্থ, সুনিশ্চিত করবে পুতুল নাচের সুতোটি যেন তাদের হাতেই থাকে চিরটা কাল। দেশের প্রতিটা মানুষের সুনিশ্চিত কল্যাণের উদ্দেশ্যে করা আধার "মানি বিল" নাম নিয়ে রাজ্যসভা বাদে লোকসভায় চুপিসাড়ে পাশ করিয়ে নেওয়া হয় দেশের প্রতিটা মানুষের প্রায় সমস্তকিছুর উপর নজরদারি করতে। দেশের প্রতিটা মানুষের মহামারীর আতঙ্ক এবং ভয়ের সুযোগ নিয়ে তাদেরকে বাধ্য করা হয় তীক্ষ্ণ নজরদারির যুগে প্রবেশ করতে।

আপনাকে মনে করিয়ে দিই, রাষ্ট্রের হাতে এই ক্ষমতা থাকলে ঠিক কী হতে পারে। পুরো এপ্রিল মাস জুড়ে আমরা দেখেছি, লকডাউনের সুযোগ নিয়ে দিল্লী পুলিশ নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত বহু ছাত্রছাত্রীকে হেফাজতে নিয়েছে। আন্দোলনকারী একজন গবেষক, যিনি একজন মুসলিম নারী এবং তখন গর্ভবতীও ছিলেন, তাঁকেও ছাড়া হয়নি। তাঁর বিরুদ্ধে এই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লীতে ঘটে যাওয়া রাষ্ট্রের শাসক-দল পরিচালিত মারাত্মক মুসলিম-নিধন যজ্ঞে (যেটাকে ধর্মীয় দাঙ্গা বলে মিডিয়া প্রচার করেছে, অর্থাৎ, যেন বা হিন্দু-মুসলিম সেখানে মারামারি-কাটাকাটি করেছে) ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ আনা হয়েছিলো এবং অবৈধ কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন বা ইউ.এ.পি.এ-এর আওতায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিলো। এই ভয়ানক গণতন্ত্রবিরোধী আইনের ফলে জামিন ছাড়াই অন্তত ছয় মাস যেকাউকে

গারদে আটকে রাখা যায়। কাশ্মীরে এক সপ্তাহে পুলিশ এই একই আইন ব্যবহার করে একাধিক সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করে।

রাজা বললেন,

হেঁয়ালি কোরো না তো, খুলে বলো।

বিজ্ঞানী কহিলেন,

এ এমন কল, যাতে রাজকার্য হয়ে যায় জল। এর সাহায্যে,
রাজভক্তি প্রকাশে নারাজ যে, তারে গড়ে তোলা একনিষ্ঠ
রাজভক্ত, মোটে নয় শক্ত।

২০১০'র নভেম্বর ১০, একটি ডাচ রিসার্চ পেপারে এটা ফাঁস হয় যে ফেসবুকে লাইক বাটন ক্লিক অথবা না ক্লিক, আপনার এই দুইরকমের ডেটা-ই ফেসবুক ট্র্যাক করছে। ফেসবুক বলেছিলো যে এটা একটা bug, মানে সফটওয়্যারের অনাকাঙ্ক্ষিত গন্ডগোল। ২০১১'র মে মাসেও The Wall Street Journal একইরকমের একটা খবর ছাপে। ওই বছরের সেপ্টেম্বর ২৫'এ একজন অস্ট্রেলিয়ান ব্লগার এটা প্রমাণ করে যে ফেসবুক থেকে লগ আউটের পরও ফেসবুক ট্র্যাক করে আমাদের। ফেসবুক এটার উত্তরে বলেছিলো, এটাও একটা bug যা তারা ঠিক করে দিয়েছে। ঠিক তার তিনবছর পর ফেসবুক নিজেই স্বীকার করে তারা লাইক বাটন ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের 'ইউজার'দের ট্র্যাক করে। সত্যিই জটিল ব্যাপার, ফেবু কর্তার ক্ষমা চাওয়ার মতোই।

শেষ নাহি যার শেষ কথা কে বলবে?

ভবিষ্যৎ কোথায়? আমাদের জাত, অর্থনৈতিক অবস্থা, লিঙ্গ, বয়স, প্রজন্ম, শিক্ষা, বেতন ,কাজ, থাকার জায়গা, ঘোরার জায়গা— এসবই শুধু নয়, আমাদের বায়োমেট্রিক ডেটা— আমাদের আঙুলের ছাপ, চোখের রেটিনার বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সবকিছুই জমা হচ্ছে তাদের হাতে। সম্প্রতি গুগল ফিটবিট কিনে নিয়েছে। অতএব আমাদের প্রতিটা মুহূর্তের শারীরিক ডেটাও তাদের কাছে বন্দী হবে, রিয়েল টাইমে। কিছু মুষ্টিমেয় ব্যক্তি বা বলা ভালো সংস্থার হাতে গোটা বিশ্বের প্রায় সমস্ত মানুষের সবকিছুর তথ্য জমা হচ্ছে। সে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই হোক বা সামাজিক, যেকোনো রকমের উৎপাদনের উপকরণ যদি কেন্দ্রীভূত হতে শুরু করে এক নির্দিষ্ট শ্রেণীর হাতে, তাহলে অবশ্যম্ভাবী ফলাফল হিসাবে সেই শ্রেণীর প্রভুত্ব কায়েম হয় বাকি সবার উপর। মানবসমাজের ইতিহাস তার সাক্ষী। সকলের সাধের গণতন্ত্র তখন মুষ্টিমেয়র অবাধতন্ত্রে পরিণত হয়। আর এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে সমস্ত উৎপাদনের, সমস্ত পরিষেবার অন্যতম প্রধান উপকরণ হলো আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের তথ্য। "কম দামে তুমি কিছু পরিষেবা পেতে চাও, আমরা তোমাকে একদম বিনামূল্যেই দেবো। বিনামূল্যে তুমি পাবে সমস্ত পরিষেবা, কেবল তোমার সমস্ত ব্যক্তিগত তথ্যের অধিকার পাবো আমরা"— এই যদি গুগল বা ফেসবুকের ইচ্ছা হয়, তাহলে আমাদের সরকার বাহাদুর আরও এক ধাপ এগিয়ে এসে আমাদের ব্ল্যাকমেল করে এই বলে যে, "তোমার স্বাস্থ্য পরিষেবায় ব্যাঘাত ঘটাবো; যদি তুমি তোমার ব্যক্তিগত তথ্য আমাকে না দাও !" দু'পক্ষই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এটা বলতে চায় যে তুমি মাছের বাজারের ছোটো ডেকচির মধ্যে থাকা একটা মাছ মাত্র, যতক্ষণ না আমাদের স্বার্থে তোমায় বিক্রি করি ততক্ষণ তোমায় বাঁচিয়ে রাখবো বটে। কিন্তু তোমার বাঁচা-মরা কেবল আমাদের দু'হাতের তেলোর নীচে, শুধুই সময়ের অপেক্ষা।

আমাদের স্বাধীন ভাবনাচিন্তা, আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা সবকিছুই আজ প্রভাবিত। প্রযুক্তিগত অগ্রগতি গোপনীয়তার অধিকারকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। ডিজিটাল অর্থনীতিকে ভিত্তি করে যে বিস্তৃত ডেটা সংগ্রহ তা টালমাটাল পরিস্থিতি তৈরি করেছে সবদিকে। আমাদের মৌলিক অধিকারগুলি সম্পর্কে আমাদের নতুন চিন্তাভাবনা ও কথোপকথন প্রয়োজন। আমাদের মতন উন্নয়নশীল দেশে, যেখানে ইন্টারনেটের সাথে আমাদের পরিচয় নতুন, সেখানে আরও বেশী করে দরকার ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তার অধিকার। সেখানে দরকার গণতন্ত্রের অনুশীলন। আমাদের ডিজিটাল জীবন সম্পর্কে আমাদের আরও ওয়াকিবহল হয়ে ওঠা। যেকোনো অ্যাপ ইন্সটল করার আগে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন পড়তে চেষ্টা করুন। ইন্টারনেটে, ফেসবুকে, হোয়াটস্যাপে ভেসে আসা খবর পড়ুন যাচাই করে। ইন্টারনেট আমাদের জ্ঞানের বিশাল ভান্ডার হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে, সেটাকে কাজে লাগান। বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে উঠুন। ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার ছাড়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কোনো ভিত্তি থাকে না।

২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারী আর মে মাসে প্রায় ৫৩ কোটি টাকা খরচা করা হয়েছিলো রাজনৈতিক বিজ্ঞাপনে, যার সিংহভাগই ছিলো বিজেপি'র। ফেসবুকের রিপোর্ট অনুযায়ী, এই দুই মাসে প্রায় ১.২১ লক্ষ বিজ্ঞাপন প্রচার হয়েছিলো ফেসবুকে, যার জন্যে খরচা পড়েছিলো মোটামুটি ২৬ কোটির কাছাকাছি। তার মধ্যে বিজেপি'র শেয়ার ৪ কোটির আশেপাশে, কংগ্রেসের শেয়ার ২৯ লাখ। জনমানসে ফেসবুক তথা সমগ্র সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাব এখানেই স্পষ্ট হয়। অথচ এর বাইরে, এরও প্রায় দ্বিগুণ-তিনগুণ পর্যন্ত সংখ্যায় ফেক নিউজ আর হেট স্পিচ 'সমৃদ্ধ' বিজ্ঞাপন, ব্লগ, ভিডিও ইত্যাদি ছড়িয়েছে। শুধুমাত্র ২০১৯ সাল জুড়ে ফেক নিউজ যুক্ত পোস্টের হিসাবই হলো ন্যূনতম ছয়হাজার প্রতি মাসে। এর বাইরেও থাকে আরো নানাকিছু, যেগুলি ফেসবুকের অতল গহ্বরে হারিয়ে গেছে ভিউয়ারকে প্রভাবিত করার পর।

ফেসবুকের একনায়কতন্ত্র আমাদের গোপনীয়তার অধিকারকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানায়। পৃথিবী জুড়ে প্রায় দুই বিলিয়ন মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য যাদের কাছে মজুত, যারা কাউকে জবাবদিহি করতে বাধ্য নয়, তাদেরই নিজস্ব প্ল্যাটফর্ম হেট স্পিচ, ফেক নিউজে ভরে উঠছে। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, ফেসবুকের দায় কাদের কাছে? গণতন্ত্রের কাছে কি? তার নৈতিকতার নির্মাণ কারা করেছে? সাধারণ মানুষ, নাকি মুনাফাসর্বস্ব, মানবঘাতী-প্রকৃতিঘাতী কর্পোরেটতন্ত্র?

ফেসবুক-কেমব্রিজ অ্যানালিটিকার ডেটা কেলেঙ্কারীর পর্দাফাঁসের মূল সাংবাদিক ক্যারল জেন ক্যাডওয়াল্ডার বলেন,

> People sometimes say that if Facebook was a country, it would be bigger than China. But this is the wrong analogy. If Facebook was a country, it would be a rogue state. It would be North Korea. And it isn't a gun. It's a nuclear weapon. Because this isn't a company so much as an autocracy, a dictatorship, a global empire controlled by a single man.
>
> ...And just as the citizens of North Korea are unable to operate outside the state, it feels almost impossible

to be alive today and live a life untouched by Facebook, WhatsApp and Instagram.

...It may turn out that Facebook isn't just bigger than China. It's bigger than capitalism.

...It comes, in the end, down to us and our wallets and what we say to these brands.

...Democracy is not guaranteed, and it is not inevitable. And we have to fight. And we have to win. And we cannot let these tech companies have this unchecked power. It's up to us: you, me and all of us. We are the ones who have to take back control.

প্রযুক্তির উন্নয়ন, সকলের সাথে সংযোগ, এই ছিলো আমাদের স্বপ্ন। প্রযুক্তিকে বাদ দিয়ে চলা সম্ভব না, প্রযুক্তির সাথে যুদ্ধ করেও জেতা যায় না। বিশাল ইন্টারনেট গতির সাহায্যে, কোনো অসুস্থ ব্যাক্তির বায়োমেট্রিক সমস্ত তথ্য জমা থাকবে হসপিটালের সার্ভারে। তার কোনো অপারেশন করতে হলে আমাদের নতুন করে তাঁর শারীরিক তথ্য পরীক্ষা করে জানতে হবে না, সাথে সাথেই সময় বাঁচিয়ে শুরু হবে অপারেশন। বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে সেরা ডাক্তারটি রিয়েল টাইমে ডেটা ট্রান্সফারের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামের হসপিটালে অপারেশন করবেন। সাহায্য করবে রোবট, যে সব জায়গায় মানুষের হাত-ছুরি-কাঁচি যেতে পারে না, সেইসব জায়গায় পৌঁছে গিয়ে। যেখানে সামান্য মিলিমিটারের এদিক-ওদিকে ভুল ঘটে যেতে পারে, সেখানে ন্যানোমিটারের প্রিসিশন নিয়ে কাজ করবে যন্ত্র! আমাদের স্বপ্ন আমাদের আরো ভালোভাবে বাঁচার, কোনো বড়ভাইয়ের সারাক্ষণের নজরদারি মেনে নেওয়া নয়।

গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি এটা নয় যে ভোটের সময়ে ভোট দিলাম। তার মূল ভিত্তি হল যেকোনো রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণে প্রতিটি জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ। আমাদের সক্রিয় হতে হবে। চিন্তায়, ভাবনায়, আচরণে। হতে হবে মানবিক। হতে হবে সংশয়ী। ডিজিটাল দুনিয়ার কোনোকিছু নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করার আগে এবং ব্যবহার করার সময় যতোটা সম্ভব জেনে নিতে নিতে যেতে হবে তার খুঁটিনাটি, তা কোন কোন তথ্য আপনার থেকে নিচ্ছে, কেন নিচ্ছে, ইত্যাদি। সামাজিক জীব হলেও মানুষের অন্যতম সাধারণ একটি প্রবণতা নিজস্বতার প্রতিষ্ঠা, নিজস্ব পছন্দের দ্বারা চালিত হওয়া। সুযোগ থাকলে সে চায় তার জামাকাপড় তার নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কোনো এক দর্জির হাতে তৈরি হোক, যেটা শুধু মাত্র তার নিজের জন্য, কারখানায় বানানো রেডিমেড কাপড় নয়। কিন্তু ঠিক কী মূল্যের বিনিময়ে আমরা আমাদের নিজস্বতা প্রতিষ্ঠা করছি, সেটি খেয়াল রাখা একান্ত প্রয়োজনীয়। নিজস্বতার বিনিময়ে আমরা আমাদের ভবিষ্যতের জীবনকে অন্ধকারে ঠেলে দিতে পারি না।

দরকার ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, তা একান্ত জরুরী এই সময়। আর তার জন্য চাই সচেতন, সক্রিয় নাগরিক। যেমন ধরা যাক, আরোগ্য সেতু অ্যাপ্লিকেশনটি প্রথমে ওপেন সোর্স ছিলো না, যার ফলে তার থেকে তথ্যচুরি সহ অন্যান্য ক্ষতির সমস্যা ছিলো অনেক বেশি। সচেতন কিছু নাগরিকের সক্রিয় অংশগ্রহণে সেটিকে ওপেন সোর্স করতে বাধ্য হয়েছে সরকার (যদিও তা শেষমেশ ওপেন সোর্স হয়েছে কি না, প্রশ্ন সাপেক্ষ)।

গণতান্ত্রিক দেশে সমস্ত ক্ষমতা থাকা দরকার আমাদের হাতে, নাগরিকদের হাতে। আমরা যেন চাইলেই গুগল ব্যবহার বন্ধ করতে পারি। সেই ক্ষমতা আমাদের হাতেই থাকা উচিত। অ্যাড পার্সোলাইজেশন, লোকেশন ট্র্যাক বন্ধ করার মতন উপায় থাকা একান্ত দরকার। এমনকি, সাধারণের হাতে এমন ক্ষমতা থাকা বাধ্যতামূলক, যা গুগলকে বাধ্য করবে স্বচ্ছতর উপায়ে নিজের প্রযুক্তিকে সাজাতে। ফেসবুকে উড়ে বেড়াতে থাকা ফেক নিউজ বিশ্বাস না করে ভাইরাল হওয়া থেকে আটকাতে পারি আমরা, যদি তৈরি হয় আমাদের মধ্যের সংশয়ী মনোভাব। সামাজিক সচেতনতা বাদে কোনো পথ নেই। আর সামাজিক সচেতনতা তৈরি হবে তখনই যখন এই মুহূর্তের মুষ্টিমেয় সচেতন ও সংশয়ী মানুষ রাজনৈতিকভাবে রাষ্ট্র ও বিশ্ব পুঁজিবাদের সাথে যুদ্ধের রূপরেখা বানাবেন এবং তা অনুসরণ করবেন। নিজেদের দাবী সাধারণের সামনে আনতে হলে দরকার দৃঢ় সংবদ্ধতা, সংগঠিত হওয়ার। সাধারণ মানুষ ক্ষমতাব্যবস্থার বানানো এই ফাঁদে পা দেওয়া বন্ধ করলে তবেই টেক-জায়েন্টরা পিছু হঠতে বাধ্য হবে। অমৃত মন্থনে বিষ ও অমৃত দুটোই উঠে এসেছিলো, এমনটাই হিন্দু পুরাণ মনে করে। আমাদের কাজ খুব সহজ, বিষটিকে চিহ্নিত করে সেটির ধ্বংসসাধনের চেষ্টা করা। আর অমৃতের সম্ভাবনার প্রতিনিয়ত খোঁজ।

লেখাটিতে ব্যবহৃত কয়েকটি ধারণা এবং শব্দবন্ধের টীকা:

Analytics
ইন্টারনেট দুনিয়া থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং পরিসংখ্যানগুলির পদ্ধতিগত গণনা ও বিশ্লেষণ। এটি নতুন তথ্য আবিষ্কার, ব্যাখ্যা এবং অর্থবহ যোগাযোগ নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

Behavioural Surplus
পরিষেবা ব্যবহারকারী তাঁর ব্যক্তিগত তথ্য পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাকে সবসময়েই দিতে থাকেন কিছু পার্সোনালাইজড (ব্যক্তিনির্দিষ্ট) এবং আরও উন্নত পরিষেবা পাওয়ার জন্য। কিন্তু সিলিকন ভ্যালির বড় বড় টেক কোম্পানিগুলি (যেমন গুগল, ফেসবুক) সেই তথ্যের থেকে অনেক বেশী তথ্য সংগ্রহ করে, প্রেডিক্টিভ বিহেভিয়ার মডেলিং-এর মাধ্যমে। পরিষেবা ব্যবহারকারীর আচরণ সম্পর্কে এই অতিরিক্ত তথ্য যেগুলি কেবলমাত্র ওই টেক কোম্পানিদের হাতেই থাকে, সেগুলি তারা বারবার ব্যবহার করে তাদের ডিজিটাল বিজ্ঞাপনের ভোক্তা বাড়ানোর জন্য, অথবা পুরোনো ভোক্তাকে বিজ্ঞাপন শুনতে বাধ্য করার জন্য। অতএব ভোক্তার স্বইচ্ছায় প্রদান করা তথ্যের মূল্য (যার বিনিময়ে ভোক্তা উন্নত পরিষেবা পান) আসলে তাঁর থেকে সংগ্রহ করা তথ্যের বাজারমূল্যের (ভোক্তার থেকে নেওয়া তথ্য ব্যবহার করে টেক কোম্পানিগুলি ব্যক্তিনির্দিষ্ট বিজ্ঞাপন বানাতে সাহায্য করার মাধ্যমে বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলির থেকে যে অর্থ পায়) চেয়ে অনেক কম।

Behaviourism
আচরণবাদ। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর আচরণ বোঝার জন্য একটি নিয়মমাফিক পদ্ধতি।

Brainwashing
কাউকে কোনো কিছু বারবার বলার মাধ্যমে সেটাকেই সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা (যদিও সেটি মিথ্যা বা অর্ধসত্য বা প্রোপ্যাগান্ডা হতে পারে) এবং বার বার বলার মাধ্যমে তার মধ্যে সেটির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার প্রক্রিয়া। সাথে সাথে অন্য কোনও তথ্য তাদের কাছে পৌঁছানো থেকে বাধা দেওয়া।

Bug
বাগ অর্থাৎ সফটওয়্যার বাগ হল কম্পিউটার প্রোগ্রাম বা সিস্টেমের এমন একটি ত্রুটি, যার ফলে প্রোগ্রামটি ভুল এবং অপ্রত্যাশিত নানান ফলাফল তৈরি করে।

Capitalism
প্রাথমিকভাবে একটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে বাণিজ্য এবং শিল্প সামাজিক ব্যবস্থাপনার

পরিবর্তে মুনাফার জন্য ব্যক্তিগত মালিকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

Commodity
পণ্য। এমন বস্তু যা কেনা বেচা করা যায়, যার বাজারমূল্য রয়েছে।

Consumer
ভোক্তা। এমন ব্যক্তি/সংস্থা যিনি নিজের ব্যবহারের জন্য পণ্য এবং পরিষেবাদি ক্রয় করেন।

Consumer Capitalism
ভোক্তা পুঁজিবাদ। তত্ত্বগতভাবে দেখলে, এমন এক অর্থনৈতিক এবং সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেখানে বিক্রেতার সুবিধার্থে ভোক্তার চাহিদাকে বৃহদাকারে ইচ্ছাকৃতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, বিভিন্ন মার্কেটিং কৌশলের দ্বারা।

Corporatocracy
একটি সাম্প্রতিক শব্দ যা কর্পোরেট স্বার্থ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা বোঝায়।

Data Breach
তথ্যসুরক্ষা লঙ্ঘন, তথ্য চুরি। এমন এক সুরক্ষা লঙ্ঘন যেখানে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার সংবেদনশীল, সুরক্ষিত বা গোপনীয় তথ্যগুলি সেই ব্যক্তি বা সংস্থার অজান্তেই বা অনুমতি ছাড়াই অন্য কোনো তৃতীয় ব্যক্তি বা সংস্থা ব্যবহার করে, কপি করে, বা চুরি করে।

Data Mining
ডেটা মাইনিং হল এমন একটি প্রক্রিয়া যা সংস্থাগুলিকে কাঁচা তথ্য দরকারী (বাজারের দিক থেকে লাভদায়ী) তথ্যে পরিণত করতে সাহায্য করে। বিপুল তথ্যসম্ভারের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট সফটওয়্যার ব্যবহার করে তথ্য-ব্যবসায়ী সংস্থাগুলি এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের গ্রাহকদের জন্য আরও কার্যকর বিপণন কৌশল নির্ধারণ করে, যার ফলস্বরূপ বিক্রয় বৃদ্ধি এবং ব্যয় হ্রাস পায়। প্রক্রিয়াটি নির্ভর করে কার্যকর তথ্য সংগ্রহ, সেগুলিকে জমিয়ে রাখা, এবং কম্পিউটার প্রসেসিংয়ের উপর।

Data Privacy and Policy
তথ্য গোপনীয়তা এবং তা সংক্রান্ত নিয়মনীতি। এই নিয়মগুলি অনুশীলনের মাধ্যমে এটা নিশ্চিত করা যায় যে ভোক্তার প্রদান করা তথ্য কেবলমাত্র তিনি যে উদ্দেশ্যে তা ব্যবহার করতে দিয়েছেন, সে উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হবে। নিজস্ব তথ্যের ব্যবহার সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কেবলমাত্র যিনি তথ্য দিয়েছেন, তাঁর হাতেই থাকবে।

Digital Economy
ডিজিটাল অর্থনীতি। এমন একটি অর্থনীতি যা ডিজিটাল কম্পিউটিং প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে নির্মিত। বর্তমানে এর বেশিরভাগটাই ইন্টারনেট এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব ও নানারকম সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মকে বাজার হিসাবে চিহ্নিত করে সেখানে ব্যবসা পরিচালনার উপর নির্ভরশীল। ডিজিটাল অর্থনীতিকে তাই ইন্টারনেট অর্থনীতি, নতুন অর্থনীতি বা ওয়েব অর্থনীতি হিসাবেও চিহ্নিত করা হয়।

Digital Personalisation
ডিজিটাল ব্যক্তিনির্দিষ্টকরণ হল পৃথক পৃথক ব্যবহারকারীর বৈশিষ্ট্য বা পছন্দ অনুযায়ী কোনো পণ্যের বিজ্ঞাপন নির্ধারণ করা। গ্রাহক পরিষেবা বা ডিজিটাল বিক্রয় বাড়ানোর জন্য এটা ব্যবহৃত হয়। কোনো একটি পণ্যের বিজ্ঞাপনের ওয়েবপৃষ্ঠাটি প্রতিটি পৃথক গ্রাহককে নির্দিষ্ট করে লক্ষ্য হিসাবে তৈরি করা হয়। ব্যক্তিনির্দিষ্টকরণ মানে হল গ্রাহকের প্রদান করা তথ্য পর্যালোচনা করে তাঁদের চাহিদা আরও কার্যকর এবং দক্ষতার সাথে পূরণ করা এবং বেচাকেনা বিষয়ক যেকোনো কাজকে দ্রুত এবং সহজতর করার মাধ্যমে গ্রাহকের সন্তুষ্টি বৃদ্ধি করা (ফলত, তাঁদের চাহিদা আরও বৃদ্ধি করা)।

Fake News
ভুয়ো খবর। ফেক নিউজ এমন একটি নতুন শব্দ যা ২০১৬ সালের পর থেকেই মূলত বহুল প্রচলিত হয়। প্রচলিত সংবাদ মাধ্যম, সোশ্যাল মিডিয়া বা নকল নিউজ ওয়েবসাইটে পাওয়া এই জাতীয় সংবাদের আসলে কোনও ভিত্তি থাকে না। যা সত্য নয়, সেগুলিকে যথার্থরূপে নির্ভুল হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়, ইচ্ছাকৃতভাবে। মোটামুটি সাত ধরনের ফেক নিউজ পাওয়া যায়—

১. ব্যাঙ্গ বা বিদ্রূপ। ক্ষতি করার কোনও উদ্দেশ্য থাকে না, কেবলমাত্র রসিকতার জন্য ব্যবহৃত হয়।

২. মিথ্যা সংযোগ। যখন কোনো খবরের শিরোনাম, ভিজ্যুয়াল, অথবা ক্যাপশন তার কনটেন্টের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়।

৩. বিভ্রান্তিকর বিষয়। কোনো সমস্যা চাগাড় দিতে বা কোনও ব্যক্তিকে ফাঁসানোর জন্য তথ্যের বিভ্রান্তিমূলক ব্যবহার।

৪. মিথ্যা প্রসঙ্গ। যখন সত্যি মিথ্যা মিলিয়ে মিশিয়ে একটি কনটেন্ট তৈরী হয়।

৫. ভণ্ডামিযুক্ত বিষয়বস্তু। যখন সত্যি খবরের উৎসকে নকল করে মিথ্যা মেক-আপ দেওয়া হয়।

৬. ম্যানিপুলেটেড বিষয়বস্তু। যখন সত্যিকারের তথ্য বা চিত্রগুলি প্রতারণার জন্য

ম্যানিপুলেট করা হয়।

৭. মনগড়া বিষয়বস্তু। যখন খবরের মূল বিষয়বস্তুটিই ১০০% মিথ্যা, কেবলমাত্র প্রতারণা এবং ক্ষতি করার জন্যই ডিজাইন করা হয়েছে।

Fundamental Rights

মৌলিক অধিকার সমূহ। সেই সমস্ত অধিকারগুলি যা মানুষের জীবন, স্বাধীনতা ও সামাজিক নিরাপত্তার সাথে জড়িত, লিখিত সংবিধান দ্বারা সংরক্ষিত ও সুনিশ্চিত। এই অধিকারগুলি ব্যক্তির অস্তিত্ব এবং সর্বাত্মক বিকাশের জন্য মৌলিক বা অপরিহার্য, তাই এদের 'মৌলিক অধিকার' বলা হয়। এগুলি ভারতের সংবিধানের তৃতীয় অংশে (অনুচ্ছেদ ১২ থেকে ৩৫) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

Hate Speech

বিদ্বেষপূর্ণ কথাবার্তা/বক্তৃতা। এইধরণের বক্তৃতাগুলি একবার ঘটে যাওয়ার পরে পরবর্তী লেখায় বা মানুষের আচরণে, অথবা গণমাধ্যমে বিপুল হারে ব্যবহার করা হয় কোনও ব্যক্তি, বা গোষ্ঠীকে আক্রমণ করতে। এক্ষেত্রে ওই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগুলি সম্পর্কে ঘৃণা উদ্রেককারী, বিদ্বেষপূর্ণ, এবং বৈষম্যমূলক ভাষা ব্যবহার করা হয়। তাঁদের ধর্ম, জাতি, বর্ণ, বংশ, লিঙ্গ ইত্যাদি নানান বিষয়ের উপর ভিত্তি করে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে এই বক্তৃতাগুলি দেওয়া হয়। সামাজিক অসহিষ্ণুতা, ঘৃণা, এবং বিভাজনের জন্ম দিতে পরিকল্পিতভাবে এগুলি ব্যবহার করা হয়।

Manipulation

নিজ সুবিধার্থে কাউকে বা কোনোকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করা। প্রায়শই অন্যায়ভাবে, বা অসৎভাবে।

Personalisation

(পরিষেবার) ব্যক্তিনির্দিষ্টকরণ। নির্দিষ্ট ব্যক্তির নির্দিষ্ট প্রয়োজনের জন্য কিছু উপযোগী পরিষেবা প্রদান করা।

Personality

ব্যক্তিত্ব। প্রতিটি ব্যক্তির চিন্তাভাবনা, অনুভূতি এবং আচরণের সম্মিলনে তৈরি হওয়া এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তিত্ব একজন ব্যক্তির মেজাজ, দৃষ্টিভঙ্গি এবং মতামত ব্যক্ত করে এবং অন্যান্য ব্যক্তির সাথে মেলামেশার সময়ে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে অন্তর্নিহিত এবং অর্জিত উভয় প্রকার আচরণগত বৈশিষ্ট্যই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

Post Truth

সত্য-উত্তর সমাজ। এমন এক সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেখানে সাধারণ মানুষ যুক্তি বা তথ্যাদির উপর ভিত্তি না করে তাদের আবেগ এবং বিশ্বাসের ভিত্তিতে কোনওকিছুকে বিচার করে, বা নিজেদের দাবী রাখে।

Post Truth Politics

সত্য-উত্তর রাজনীতি। একটি রাজনৈতিক সংস্কৃতি যেখানে নীতি, যুক্তি, তথ্য ইত্যাদি বাদ দিয়ে কেবলমাত্র আবেগকে প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং সত্যিকারের যুক্তিতথ্যকে অগ্রাহ্য করে সভাসমাবেশ, বক্তব্য, তর্কাতর্কি করা হয়।

Predictive Behaviour Modelling

ভোক্তার অতীত (মূলত ডিজিটাল) লেনদেনের তথ্যের উপর ভিত্তি করে অঙ্ক ও পরিসংখ্যানের সাহায্যে ভোক্তার ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক ও অন্যান্য আচরণ সম্পর্কে ধারণা করা। ভোক্তার আচরণ ধারণা করেই এই প্রক্রিয়া থেমে থাকে না, বিশেষজ্ঞ ও বিপণনকারীদের কাছেও এই সংক্রান্ত বিশ্লেষণ গিয়ে পৌঁছায় যাতে তারা ব্যবসার আগামীদিনগুলির জন্য ভোক্তা সংক্রান্ত সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

Privacy

ব্যক্তিগত বা গোপনীয় যেকোনো বিষয় যেখানে অন্যের পর্যবেক্ষণ বা নজরদারী কাম্য নয়।

Social Media

ওয়েবসাইট বা কম্পিউটার পরিচালিত বিভিন্ন প্রোগ্রাম যেগুলি কম্পিউটার বা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যবহার করে মানুষ নিজেদের পছন্দমতন অন্যান্য ব্যক্তির সাথে সামাজিক যোগাযোগ গড়ে তোলেন। পাশাপাশি, নানাবিধ তথ্য ভাগ করে নেন নিজেদের মধ্যে। তবে আমাদের জীবনে সোশ্যাল মিডিয়া কেবলমাত্র বন্ধুর পরিধি বাড়ায় না, আমাদের বিনোদনের মাধ্যম হিসেবেও এটি কাজ করে।

Social Media Advertising

কোনো পণ্য বা অর্থের বিনিময়ে দেওয়া পরিষেবা সম্পর্কে প্রচারের জন্য যখন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এবং ওয়েবসাইটগুলি ব্যবহৃত হয়।

Survillance

কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার দ্বারা অপর কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার (মূলত গোপনে) অতি ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ, নজরদারি।

Surveillance Capitalism

এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা এখানে না করে আমরা সরাসরি সোশানা জুবফের বই থেকে কিছু অংশ তুলে দিতে চাই—

1. A new economic order that claims human experience as free raw material for hidden commercial practices of extraction, prediction, and sales;

2. A parasitic economic logic in which the production of goods and services is subordinated to a new global architecture of behavioral modification;

3. A rogue mutation of capitalism marked by concentrations of wealth, knowledge, and power unprecedented in human history;

4. The foundational framework of a surveillance economy;

5. As significant a threat to human nature in the twenty-first century as industrial capitalism was to the natural world in the nineteenth and twentieth;

6. The origin of a new instrumentational power that asserts dominance over society and presents startling challenges to market democracy;

7. A movement that aims to impose a new collective order based on total certainty;

8. An expropriation of critical human rights that is best understood as a coup from above: an overthrow of the people's sovereignty."

Surplus Value in Marxism

বাড়তি বা অতিরিক্ত মূল্য। শ্রমিক তার উৎপন্ন পণ্যের বাজারজাত বিক্রয়মূল্যের থেকে অনেক কম মূল্য পায় তার শ্রমমূল্য হিসাবে। এই বাড়তি বা অতিরিক্ত মূল্য কেবলমাত্র পুঁজিপতি কারখানার মালিকের হাতেই থাকে, যা তারা পুনরায় পুঁজি বাড়ানোর প্রক্রিয়ায় ঢালে এবং মুনাফা বাড়িয়ে চলে। পুঁজিপতি দ্বারা নির্ধারিত শ্রমশক্তির মূল্যের পরিমাণ এবং শ্রমশক্তির দ্বারা যে পরিমাণ মূল্য সৃষ্টি হয় বাজারের জন্য, তা কখনোই সমান হয় না। এই তফাতটাই হল সারপ্লাস ভ্যালু।

Targeted Advertisement

এমন এক বিশেষ ধরনের বিজ্ঞাপন যা বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রচারিত পণ্য বা ব্যক্তির উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন গ্রাহক বা ভোক্তার দিকে পরিচালিত হয়। এই বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রাহকের ডেটা মাইনিং-এর মাধ্যমে ঠিক করা হয়। এগুলি ডেমোগ্রাফিক হতে পারে যা ভোক্তার জাতি, অর্থনৈতিক অবস্থা, লিঙ্গ, বয়স, প্রজন্ম, শিক্ষার স্তর, আয়ের স্তর এবং কর্মসংস্থান ইত্যাদিকে পর্যালোচনা করে। অথবা হতে পারে সেগুলি ভোক্তার মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, যেমন ভোক্তার মূল্যবোধ, ব্যক্তিত্ব, দৃষ্টিভঙ্গি, রাজনৈতিক মতামত, জীবনধারা, আগ্রহ ইত্যাদি। ভোক্তার ডিজিটাল আচরণের উপরেও এই বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ভরশীল হতে পারে, যেমন তাঁর ব্রাউজারের ইতিহাস, ক্রয়ের ইতিহাস এবং অন্যান্য সাম্প্রতিক ডিজিটাল ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি।

The Big five Personality Traits

মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য তত্ত্বে বিগ ফাইভ পার্সোনালিটি বৈশিষ্ট্য এক রকমের শ্রেণী বিভাগ। এটা ফাইভ-ফ্যাক্টর মডেল এবং ওসিয়ান মডেল নামেও পরিচিত। মানবসমাজে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যালোচনা করে এই তত্ত্ব একটি শ্রেনী বা গোষ্ঠীকরণ প্রস্তাব করে। পাঠিকার কাছে অনুরোধ এই ব্যাপারে বিস্তারে জানতে ইন্টারনেট-এর সাহায্য নিতে, এই সংক্রান্ত তথ্য সহজলভ্য।

User

পরিষেবা ব্যবহারকারী। একজন ব্যক্তি যিনি কম্পিউটার বা নেটওয়ার্ক বা অন্য যেকোনো পরিষেবা ব্যবহার করেন। কম্পিউটার সিস্টেম এবং সফটওয়্যার পণ্যগুলির ব্যবহারকারীরা সাধারণত প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত দক্ষতার অভাবের জন্য কিভাবে সেই সিস্টেম টি কাজ করে তা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকেন।

Whistleblower

এমন ব্যক্তি যিনি কোনও বেসরকারী বা সরকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে বা সরকারের কাছে অন্য কোনো সংস্থার গোপনীয় তথ্য বা ক্রিয়াকলাপ ফাঁস করে দেন; সাধারণত সেই তথ্য বা কার্যকলাপগুলি অবৈধ, অনৈতিক, বা সামাজিকভাবে সঠিক নয় বলে বিবেচিত।

প্রবন্ধটিতে ব্যবহৃত তথ্যাদি যে সমস্ত অনলাইন উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে সেগুলির একটি অনলাইন ভান্ডার এখানে পাবেন:

http://bit.ly/3hZ8uoE

কয়েকটি প্রাসঙ্গিক সিনেমা বা ডকুমেন্টারি:

- Terms and Conditions May Apply (2013)
- The Great Hack (2019)
- Citizenfour (2014)
- The Social Dilemma (2020)

"Shoshana Zuboff"; "surveillance capitalism" এই দুটি keyword সার্চ করলে অনেক ডকুমেন্টারি ফিল্ম পাওয়া যাবে ইউটিউবে।